দ্যুতি।

(বিবিধ প্রবন্ধ।)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

"I count him a great man who inhabits a higher sphere of thought, into which other men rise with labour and difficulty : he has but to open his eyes to see things in a true light, and in large relations ; whilst they must make painful corrections, and keep a vigilant eye on many sources of error". *Emerson.*

"Do Thou, then, breathe those thoughts into my mind
By which such virtue may in me be bred
That in Thy holy footsteps I may tread ;
The fetters of my tongue do thou unbind,
That I may have the power to sing of Thee,
And sound Thy praises everlastingly."—*Wordsworth.*

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত এবং ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

আনন্দ-আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬ই ভাদ্র, ১৩০২।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত।

দত্ত,

তুমি আর আমি, বাল্যকাল হইতে এই সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি,—পরিত্যক্ত, নির্যিত, ঘৃণিত, নিন্দিত। দুই জনই বুঝিয়াছি, এ পৃথিবীর লোক মানুষের সৎগুণও বুঝে না, দোষ অপরাধও বুঝে না;—যাহা গুণ, তাহারই নিন্দা করে; যাহা দোষ, তাহারই আদর করে। তুমি আর আমি, পিতৃহীন, মাতৃহীন,—সহায়হীন, সম্বলহীন। তুমি আর আমি, জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ভক্তি-হীন, কর্ম্মহীন। শুধুই ভ্রমণ যেন আমাদের লক্ষ্য—শুধুই যেন ঘুরিয়া ফিরি-তেছি। বড় হইব, আমাদের সে বাসনা নাই, জগতের সম্মান পাইব, সে কামনাও নাই। এই জন্যই, আমরা উভয়ে উভয়ের সুহৃৎ। এই জন্যই, উভয়কে উভয়ে চিনিয়াছি। এই জন্যই, তোমাকে যে জন্য লোকেরা নিন্দা করে, আমি তাহার জন্যই ভালবাসি; তুমিও, যে জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে, তাহার জন্যই আদর কর। আমাদের দুয়েরই লক্ষ্য, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দধাম, আমাদের দুইয়েরই সহায় স্বাধীনতা,—অনাবিল, পবিত্র, মধুর, জীবনপ্রদ স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে বলিব, স্বাধীনভাবে লিখিব, স্বাধীনভাবে ভাবিব, স্বাধীন ভাবে খাটিব। স্বাধীনভাবে লিখিয়া ও বলিয়া, স্বাধীনভাবে ভাবিয়া ও খাটিয়া, স্বাধীনভাবে চলাই আমাদের উভয়ের ব্রত। ইচ্ছা, এইরূপ চলিয়া বিধাতার চরণপ্রান্তে পৌছিব। তাঁহার খাতিরে তুমিও সমাজত্যাগী, আমিও সমাজত্যাগী। আদর অভ্যর্থনার প্রত্যাশা, এ জগতে, আমাদের আর কোথাও নাই। আমরা কামনা-বর্জ্জিত, বাসনা-রহিত, দারিদ্র্য-মণ্ডিত। এই অবস্থায়ও, বিধাতার কৃপায়, তুমিও সুখী, আমিও সুখী। আমাদের সুখ অপার্থিব, যশ মানের অতীত। আমরা বাঁচিয়া আছি, কেবল বিধাতার রাজ্যের এই সুখের জন্য। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে যে সকল কথা পাইয়াছি, তাহা শুনি-বার লোক বড় বেশী নাই বলিয়া তোমাকেই শুনাইতে চাই। আমি জানি, স্বাধীন জীবের স্বাধীন কথা তুমি যেমন শুনিতে ভালবাস, এমন লোক এই পঙ্কিল পৃথিবীতে বড়ই বিরল। মন দিয়া পড়িবে, ইহারই জন্য "দ্যুতি" তোমার আশ্রয়ে পাঠাইলাম। আমরা যেমন চলিতেছি, চিরদিন, তেমনই স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন পথে চলিব, পরস্পরের কথা বলা ও শুনায় কেবল অনুরাগ-লাভ। আমি তোমার নিকট, আদর বা অভ্যর্থনা, কিছুরই প্রত্যাশী নই।

আনন্দ-আশ্রম।
৬ই ভাদ্র, ১৩০২ সাল।

তোমার অতুল স্নেহের—
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

সূচী।

দ্যুতি।

সান্ত ও অনন্ত।

"The world proceeds from the same spirit as the body of man. It is a remoter and inferior incarnation of God, a projection of God in the unconscious."

"If your eye is on the eternal, your intellect will grow, and your opinions and actions will have a beauty which no learning or combined advantages of other men can rival."—*Emerson.*

একদিন সায়ংকালে পুরুষোত্তমের সাগরকূলে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা নিরীক্ষণ এবং অনুধাবন করিতেছিলাম। অনন্ত-প্রসারিত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-গর্জ্জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগকে এক অপরূপ সাত্ত্বিক জগতে উপনীত করিল। কত দেখিলাম, কত ভাবিলাম এবং কত মোহিত হইলাম! দেখিলাম, প্রকৃতি সীমাবিশিষ্ট হইয়াও, স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, অনন্তের আভাস দিতেছে; অথবা যাহা অনন্ত, তাহাই সীমাবদ্ধ হইয়া, এই বিশাল বিস্তৃত সাগরেও যেরূপ সীমা দেখা যায়, তদ্রূপ, আমার নয়নকে ধান্দা দিতেছে। অনন্ত গগনের ন্যায় সাগর বিশাল বিস্তৃত হইলেও, আমি তাহার অল্পাংশই দেখিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম, ঐ সাগরের ন্যায়, আমার ক্ষুদ্র চেতনা-শক্তি এক মহাচৈতন্যের পরিচয় দিতেছে। মোহিত হইলাম—জড় এবং চৈতন্য, এই উভয়ের সংমিশ্রণে বিধাতার যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি রচিত, এই প্রকৃতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও মহান্ অপার অগম্য আদিশক্তি ব্রহ্মেরই সত্ত্বামাত্র। এইদিন জীবনের একটী বিশেষ দিন গিয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলাম এবং যাহা ভাবিয়াছিলাম, জগতের নিকট তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতে পারি, সে শক্তি নাই। বিধাতা আমাদিগের সহায় হউন।

আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, এই বিচিত্র প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতাত্মিকা। অন্যদিকে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও

---

* এই বিষয়ে কটক টাউনহলে ৯ই চৈত্র, ১২৯৫, রাঁচি-জেলা-স্কুলহলে ১৫ই চৈত্র, ১২৯৭, এবং ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ-হলে ৬ই আশ্বিন, ১২৯৯, আমি যে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত এবং ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

তমঃ,এই ত্রিগুণান্বিতা। বিবিধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, রূপান্তরে এবং ভাষান্তরে, প্রকৃতিকে, নানা কথায়, নানা ব্যাখ্যায় ঐ সকল ভূত এবং গুণ সমন্বিতা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, প্রাচীন এবং নবীন এই উভয় যুগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, জড় এবং মায়া, আত্মা এবং কায়া, সেশ্বর এবং নিরীশ্বরবাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলি, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছুর অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানায়াত্ত হইয়াছে, সে সকলই এক মহান্ অপার অনন্ত শক্তির আভাস দিতেছে। অথবা যাহা অনন্ত, তাহাই মনুষ্যের ধারণাশক্তির (Conception) আয়ত্তাধীন হইবার জন্য সীমাবদ্ধভাবে উপস্থিত হইতেছে। ক্ষুদ্র যাহা, সীমাবিশিষ্ট যাহা দেখি, বোধ হয়, সে সকলই অনন্তের ছায়ামাত্র।

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, এই প্রকৃতির সকল বস্তুই সীমাবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টি বলিলেই তাহাকে সান্ত বলিয়া মনে হয়। সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যের দর্শন ও ধারণাশক্তি (Perception and conception) অতি সামান্য, কতকদূর যায়, তারপর আর দৃষ্টি ও ধারণাশক্তি যায় না। যেমন সাগরের কতক অংশের পর আর দৃষ্টি চলে না, সেইরূপ, বোধ হয়, মানুষ অনন্তের ভাব ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রকৃতিকে সীমাবিশিষ্ট মনে করে; সীমা লইয়া, ক্ষুদ্র লইয়া থাকিতেই ভালবাসে। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, ক্ষুদ্র ও সীমাবিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের আভাস পাওয়া যায় কি না?

জড়ের কথাই প্রথম আলোচনা করি। জড় কি? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, জড় অবিনশ্বর পরমাণুর সমষ্টি। জড় বিশ্লেষ করিলে পরমাণুই পাওয়া যায়। এই পরমাণু কি?—জড়ের এমন ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহা আর বিভাগ করা যায় না, অর্থাৎ জড়ের যে অংশ মানুষ কখন দেখি নাই, অথবা যে অংশ কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ভাবিতে হয়। পরমাণু মানুষ কখনও দেখে নাই—দেখিতে পারে নাই, অর্থাৎ এমন কিছু, যাহার মূলে দৃষ্টি চলে না, অর্থাৎ যাহা অনন্ত। পরমাণুর সমষ্টিতে পর্ব্বতের উৎপত্তি, রাজ্য ও জনপদের উৎপত্তি, এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির উৎপত্তি। পরমাণু জমিয়া যখন বিরাট পর্ব্বত অথবা মৃত্তিকা-স্তর হইয়াছে, সে পর্ব্বতকে ও মৃত্তিকাস্তরকে ধারণা করিতেও মানুষ অসমর্থ। পর্ব্বত বা মৃত্তিকা-স্তরের একাংশ দেখিয়া মানুষ অপর অংশের কথা ভাবিয়া লয়; সর্ব্বাংশ কখনও মানুষ দেখিতে পারে না। যাহা দেখে নাই, পরোক্ষজ্ঞানে তাহা কল্পনা করে। পরমাণুর আদিতে কল্পনা,

পরমাণুর পরিণতিতে অথবা সমষ্টিতেও কল্পনা। মানুষের জ্ঞান ও ধারণাশক্তি এতই সীমাবদ্ধ। অথবা দেখ, প্রকৃতির একটী সামান্য পরমাণু কত বড় যে, তাহা ভাবিতে ও ধারণা করিতে মানুষ অসমর্থ হইয়া কত কাল্পনিক স্বপ্ন দেখিতেছে। প্রকৃতিতে কত পরমাণু আছে, কেহ জানে না; পরমাণুর শেষ কোথায়, তাহাও জানে না; আবার পরমাণুর সমষ্টিতে কত পর্ব্বত-জগৎ হইয়াছে, তাহাও মানুষ ঠিক বলিতে পারে না। দেখ, সান্ত ও অনন্তের কেমন যোগ!

বিন্দু বিন্দু জলকণা সকল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। এই বাষ্পকণা সকল জমিয়া জমিয়া মেঘ হইতেছে। মেঘকণা সকল জমিয়া জমিয়া পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইতেছে; পার্ব্বতীয় শক্তিতে দ্রব হইয়া, বৃষ্টি-প্রবাহে, ঝরণা প্রবাহে ধরাকে শীতল করিতেছে। বৃষ্টি-বারিরাশি এবং ঝরণা-বারিরাশি মিলিয়া মিলিয়া নদী উৎপন্ন করিতেছে। নদীকণা সকল মিলিয়া মিলিয়া কত বড় বড় সাগরে পরিণত হইতেছে। দেখ, কত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বারিকণার সমষ্টিতে কত বড় সাগরের উৎপত্তি। পলকহীন চক্ষুতে সাগরের দিকে চাহিয়া দেখ, সাগরের যে অংশ দেখিতে পাইবে, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু অনন্ত তাহার পশ্চাতে। অনন্তের ঢেউ, অনন্তকাল বহিয়া বহিয়া এই-রূপে যেন মানুষের নয়নাধীন হইতেছে। পৃথিবীর সাগরে কত জল, কত তরঙ্গ, কেহ জানে না, কেহ বুঝে না। সান্তে, অনন্তের আভাস দেখ।

সময়ের কথা ভাব। একটী মুহূর্ত্তের কথা চিন্তা কর। তোমার সম্মুখে একটী মুহূর্ত্ত—পরিসর নাই, ব্যাপ্তি নাই, তিলেকমাত্র। এই মুহূর্ত্তই, কত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে আয়ুঃ— জীবন-মরণ-কাল। এই মুহূর্ত্তে কত মস্তিষ্ক হইতে কত অনন্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই মুহূর্ত্ত, কাহারও জন্ম বা কাহারও মৃত্যুর কারণ হইতেছে। মুহূর্ত্ত, কত জনকে পথের ভিখারী করিতেছে, কত ভিখা-রীকে রাজসিংহাসনে বসাইতেছে। মুহূর্ত্ত, ভক্তের প্রাণ হইতে একটীবার মাতৃনাম উচ্চারণ করাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া দিতেছে। মুহূর্ত্ত-মহিমা চিন্তা করিলে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়। অথচ মুহূর্ত্ত অতি সামান্য জিনিস। এই মুহূর্ত্ত জমিয়া জমিয়া ঘণ্টা বা প্রহর, ঘণ্টা বা প্রহর জমিয়া জমিয়া দিন রাত্রি, দিন রাত্রি জমিয়া জমিয়া সপ্তাহ,—তার পর মাস, তার পর বৎসর, তার পর যুগ, তার পর শতাব্দী রচনা করিতেছে। শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত দর্শন বিজ্ঞান, কাব্য ইতিহাস আবিষ্কার হইতেছে। পৃথিবীর বয়স কত কে জানে? কোথা হইতে সময়ের আরম্ভ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোথা বা সম-

য়ের পরিসমাপ্তি, তাহাই বা নির্ণয় কে করিতে পারে? ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—আদি অন্তে অনন্ত শৃঙ্খলে বাঁধা। ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—অনন্তের ছায়া। সময় যেমন অনন্ত-জ্ঞাপক যন্ত্র, এমন আর দ্বিতীয় নাই। ভাবিলে মোহিত হইতে হয়।

সৃষ্টির আদি কল্পনা করা যদি মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে কল্পনা কর, যেরূপে যে ভাবেই হউক, প্রথমে যেন কেবল একটী গাছের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই বৃক্ষে নয়নতৃপ্তিকর কত ফুল, কত ফল শোভা পাইয়াছে। সেই ফুল কালে ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই বৃক্ষ কালে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কত অঙ্কুর রহিয়া গিয়াছে। বীজাঙ্কুর সহ পরিপক্ক কত ফল মৃত্তিকায় পড়িয়াছে, তাহা হইতে কালে কত বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে। আদি বৃক্ষ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই আদি হইতে পৃথিবীতে কত বন জঙ্গল অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বন জঙ্গল অরণ্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বিলীন হই-তেছে, আবার নূতন বন জঙ্গলের সৃষ্টি হইতেছে। আদিতে একটী বৃক্ষ কল্পনা না করিলেও বুঝা যায়, একটী বৃক্ষ বহু বৃক্ষের মূল—একটী বৃক্ষ হইতে পৃথিবী ঘোর অরণ্যে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবীতে কত বৃক্ষ, কত জঙ্গল আছে, কেহ জানে না। সান্তের ভিতরে এখানেও অনন্তের আভাস পাওয়া যায়।

একটু একটু মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে। আমাদের শরীর জুড়াইতেছে; আমরা অম্লজান (Oxygen) টানিয়া লইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। এই একটু একটু শীতল বায়ু যখন প্রবল প্রচণ্ড ঝড় আকার ধারণ করে, আমরা ভয়ে জড়সড় হই, আমাদের সাহস বীর্য্য উড়িয়া যায়। এই ঝড় সাগরে কত তরঙ্গ তুলে, কত জাহাজ ভাঙ্গে, কত বাড়ী ঘর চূর্ণ, ও কত বৃক্ষ পাহাড় উৎ-পাটন করে। এই বায়ুরাশি কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না। কত দিন বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, ভূমণ্ডলে কত বায়ু আছে, কেহ জানিতে পারে নাই। একটু বায়ুর পশ্চাতে দেখ, কত বড় অনন্ত বায়ু-সাগর সংমিশ্রিত রহিয়াছে। সান্ত তাহাকে বলি, যাহার অন্ত গণনা করা যায়। আর অনন্ত তাহাকেই বলি, যাহার অন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। বায়ুর আদি অন্ত কে নির্ণয় করিতে পারে? এইরূপে যে সীমাবিশিষ্ট পদার্থ ধরি, একটু চিন্তার পরই দেখি, তাহারই পশ্চাতে সীমারহিত একটা বিরাট অনন্ত সংযুক্ত রহিয়াছে।

বিদ্যুতের কথা ভাব। বিদ্যুৎ কি, তাহার আজও ব্যাখ্যা হয় নাই, কিন্তু প্রবাদ এইরূপ, পৃথিবীর দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এই বিদ্যুতের প্রবল

প্রবাহ সর্ব্বক্ষণ বহিতেছে। এই বৈদ্যুতিক আকর্ষণে জগৎ নিয়মিত হইতেছে। মানুষ ব্যাটারীতে যে এক বিন্দু বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিয়াছে, এই বিদ্যুৎকণার সহিত সমস্ত জগৎ-ব্যাপ্ত বিদ্যুতের সংযোগ। বিদ্যুতের ক্ষমতা কত, সকলেই জানেন। এক বিন্দু বিদ্যুৎ সংস্পর্শে মানুষের সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হয়, মুহূর্ত্তমাত্রে মানুষের প্রাণ দেহ-বিচ্যুত হয়। মানুষ বিদ্যুৎ লইয়া আজ কাল ক্রীড়া করিতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ কি জিনিস, ইহার আদি অন্ত কোথায়, মানুষ জানে না। বিদ্যুতের পশ্চাতে এক মহা অনন্তশক্তি প্রধাবিত।

প্রকৃতির এ সকল বিভাগের অনুধাবন ছাড়িয়া চৈতন্য-জগতে যাই। মানব সৃষ্টি, বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। মানব দেহে জড় ও চৈতন্য, উভয়ই আছে। মানব দেহ পঞ্চভূতাত্মক, প্রাণ মন ত্রিগুণান্বিত। মানবকে বিশ্লেষ করিলে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মানুষের এই ত্রিবিধশক্তির ভিতরেও কি অনন্তের ছায়া পাওয়া যায়? অনুধাবন করি।

বিবর্ত্তনবাদ জগতে প্রকাশ করিয়াছে, সামান্য বস্তু হইতে মহতের উদ্ভব এবং জড় হইতে চেতনের জন্ম সম্ভব। আদি মানুষের (স্ত্রীপুরুষ) এক বিন্দু শোণিত হইতে পৃথিবীর অগণিত মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, বিবর্ত্তনবাদ বিশ্বাস করিয়াও ইহা স্বীকার করা যায় যে, এক স্ত্রী ও পুরুষের এক বিন্দু শোণিত হইতে কোটী কোটী মানুষের উৎপত্তি হইতে পারে। এক মানুষ মরিতেছে, দশ বিশ সন্তান পশ্চাতে রহিতেছে; সেই দশ বিশ লোপ পাইতেছে; কিন্তু তাহা হইলে শত, সেই শত হইতে সহস্র,সহস্র হইতে কোটী কোটী মানুষ জন্মিতেছে। একখানি সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম,একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ভূমধ্য সাগরের কড্ নামক মৎস্য যদি মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত না হইত, তবে ১৫ কি ২০ বৎসরে ভূমধ্যসাগর কড্‌মৎস্যে পূর্ণ হইয়া যাইত। জনসংখ্যার বৃদ্ধিও এইরূপ। মনুর সন্তানের বংশ বৃদ্ধি দর্শন করিলে বিস্ময় উপস্থিত হয়। এক পিতৃপুরুষ হইতে কত জাতি হইয়াছে, প্রাচীন বংশ সকলের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। আমাদের দেশে ঋষিদিগের নামানুসারে গোত্র হইয়াছে। এক গোত্রে এখন কত লোক হইয়াছে, গণনা হয় না। এক বিন্দু মানুষের শক্তিতে কি এক অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত ব্যাপার পরিলক্ষিত হইতেছে।

সমষ্টিতে মানব শক্তি কত বিস্তৃত,ধারণা করা যায় না; অন্যদিকে ব্যষ্টিতে মানুষের শক্তি কত, তাহাই কি ধারণা হয়? সমষ্টিতে মানব দৈহিক বলে

সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী বিকম্পিত,—কত রাজ্যের উত্থান, কত রাজ্যের পতন হইতেছে, কত বংশের বিনাশ এবং কত বংশের অভ্যুদয় হইতেছে। আর ব্যষ্টিতেই কি মানব সামান্য? মহাত্মা এমারসন বলিয়াছেন—"মানবের শক্তির কথা যখন ভাবি, তখন আত্মহারা হইয়া যাই, দেখি, অচিন্ত্য বিশ্বশক্তি যেন প্রতি মানব হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত।" ঈশামুশার ন্যায় এক একজন মানুষের দ্বারা পৃথিবী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতে পারে। মানুষ কি ভাবে, কি করে, কেহ বলিতে পারে না। প্রতি ব্যক্তির ভিতরে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তার তরঙ্গ অবিরত খেলিতেছে, কেহ জানে না। কেহ কাহারও মন আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের শক্তির অন্ত কোথায়? আদি সময় হইতে কত মানুষ এবং মানুষের বংশ লোপ পাইয়াছে, কত মানুষ এবং মানব-বংশ অভ্যুদিত হইয়াছে, এখনই বা পৃথিবীতে কত মানুষ আছে, কে গণনা করিতে পারে? প্রতি মানুষের শরীরে কত শক্তি নিহিত, তাহারও কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতি নূতন হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষ নূতন হইতেছে। প্রতি সামান্য মানুষেরই হৃদয়ে যেন অসামান্য অনন্তের ছায়া,—কত বল, কত বীর্য্য, কত চিন্তা, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, ধারণা হয় না। মানুষের চিন্তা, জ্ঞান ও বীর্য্যবলে এই সসাগরা পৃথিবী ধন ধান্যে, শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে। দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, রাজ্যের পর রাজ্য—আজ মানুষের অজেয় শক্তি ঘোষণা করিতেছে। মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা কত কাব্য, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, কে সংখ্যা করিতে পারে? যুগান্তব্যাপী, শতাব্দ-ব্যাপী সাধনার ফলে মানব সৃষ্টির রাজত্ব পাইয়াছে। মানুষের প্রতি কথায় অনন্ত জ্ঞান পরিব্যক্ত, প্রতি কাজে অনন্ত শক্তি বিকশিত। সামান্য একটী মানুষের বিষয় ভাবিতে বসিলেও হৃদয় মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। মানুষের কত প্রেম, কত চিন্তা, কত কাজ—সকলেরই ভিতরে যেন অনন্ত প্রতিভাত। বড় কাজ, বড় কথা, ছোট কাজ, ছোট কথা—সবই অবিনশ্বর, সবই প্রয়োজন। কোনটীর অভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হয় না। যত সামান্য সামান্য বিষয়, যত সামান্য সামান্য কথা কল্পনা হয়, ভাবিয়া দেখ, অবাক্ হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মানুষ—যেন বিশাল অনন্তের প্রতিকৃতিমাত্র।* আবার বলি, মানুষ ভাবে কি, মানুষ

* "I become a transparent eyeball, I am nothing: I see all the currents of the Universal Being circulate through me: I am part and particle of God."—*Emerson*.

করে কি? যত সামান্য বিষয় ভাবে বা যত সামান্য কাজই করে, সে সকলেরই লক্ষ্য অনন্ত। ভাবিতে আরম্ভ করিয়া কেহ আজ পর্য্যন্ত ভাবনার কূল পায় নাই, কাজ করিয়াও কেহ কাজ শেষ করিতে পারে নাই। প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া কেহ বাসনাকে নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। দেখ, প্রেমের আকর্ষণে মানুষ পাগল, পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র হইতে তাহার ভালবাসা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এখন সে আর তাহাতে তৃপ্তি পায় না—সে আরো চায়, আরো চায়। ভালবাসিয়া তার বুকের পিপাসা মিটে নাই। সে জ্ঞান, পুণ্য, ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে লালায়িত হইয়াছিল, কিন্তু যত উপার্জ্জন করিয়াছে, ততই তাহার বাসনার আগুন জ্বলিয়াছে। জ্ঞান-পিপাসা, ঐশ্বর্য্য-পিপাসা, বা পুণ্য-পিপাসা, মানুষের যত পিপাসা কল্পনা করা যায়, মরণ পর্য্যন্তও কোন পিপাসারই নিবৃত্তি নাই। তাহার শরীর চায়, মন চায়, ইন্দ্রিয় চায়, বৃত্তি চায়, রিপু চায়; সকলই "দে দে" মহারবে মাতোয়ারা। দিক্‌হারা মানুষ পাপে ডুবিতে ধায় যখন, তখনও অনন্ত পাপে সে ডুবিবে; যখন ধর্ম্মে উঠিতে চায়, তখনও অনন্ত পর্য্যন্ত ছুটিবে। দিবানিশি সে ব্যস্ত। দিবানিশি সে দারুণ পিপাসায় মাতোয়ারা। তাহার অভাব কোন দিনও ঘুচিল না। তাহার পিপাসা কোন দিনও মিটিল না!

বাইবেল গ্রন্থ বলে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। মানুষের সৎপ্রবৃত্তির পিপাসা, মানুষের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তেজ ও শক্তির কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে নিমগ্ন হই, এবং মনে করি, সত্যই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। মানুষ স্থষ্টির রাজা, এ কথা বলিলেও মানবত্ব সম্যক্ প্রকাশ হয় না। ঈশ্বর মানব ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই কথা বলিলেই যেন অধিক যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু অন্য দিকে মানবের পৈশাচিক প্রক্রিয়ার কথা যখন মনে হয়, তখন আর এভাব মনে থাকে না; মনে করি, "মানুষকে যে তাহার পূজা করি?" আর যা হউক, তা হউক, এখানেও মানুষের অনন্তত্ব ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। স্থষ্টির আলোকের ধারে অন্ধকার, পুণ্যের ধারে পাপ বিধাতার স্থষ্ট কি না, জানি না, কিন্তু ইহা জানি, অনন্ত যদি আলোক, তবে অন্ধকারও অনন্ত; পুণ্য যদি অনন্ত, তবে পাপও অনন্ত। সকলের মধ্যেই অনন্তের বিশাল-বিস্তৃত আভাস পাওয়া যায়।

কোটী কোটী পরমাণু জমিয়া জমিয়া এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী সুসজ্জিত

হইয়াছে; কোটী কোটী পরমাণু জমিয়া জমিয়া ঐ অনন্ত নক্ষত্র-জগৎ বিরচিত হইয়াছে। সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অনন্ত বালুকাপূর্ণ পুরুষোত্তমের সাগরতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সবই অনন্ত—সাগরে অনন্ত তরঙ্গরাশি এবং আকাশে চন্দ্র সূর্য্য অবিশ্রাম দিবারাত্রি কত শতাব্দী ধরিয়া অবিরত ছুটিতেছে। যাহা ভাবি, সবই অনন্ত। সাগরের কূল নাই, আকাশের কূল নাই,—সাগর-তীরের অতলস্পর্শ বালুকারাশির কূল নাই, আকাশের নক্ষত্ররাশিরও কূল নাই। ভাবিলাম,—মানব-পরিবারের কূল নাই, মানব সম্প্রদায়ের কূল নাই। ভাবিলাম,—কূল নাই একটী বৃক্ষের, একটী নক্ষত্রের, এক গাছি তৃণের, একটী বালুকণার, একটী মানুষের। যাহা ভাবি—সবই যেন অনন্ত। সব সীমা যেন অসীমে ধাবিত, অথবা অসীমে বিলীন;—সান্ত যাহা ছিল, সব যেন আজ অনন্ত হইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম এবং ডুবিলাম এবং বিস্ময়ে অনন্তের উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম করিলাম।

ভাই, তুমি পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতির সীমাকে ভালবাস, অসীম কিছুই দেখিতে পাও না? এই সকল কথার পর, একবার সীমার বিষয় চিন্তা করত দেখি। কিসের কূল আছে, কাহার অন্ত আছে? যাহা দেখিতেছ, উহা সব অনন্ত! পৃথিবীর কত বয়স হইয়াছে, তুমি জান না। পৃথিবীতে কত নদনদী, কত বৃক্ষ লতা, কত পাহাড় পর্ব্বত আছে, তুমি জান না। পৃথিবীতে কত পরমাণু, কত জীব আছে, কত জীব মরিয়াছে, তাহা জান না। সন্ধ্যার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের বিষয় তুমি কিছুই জান না। জান কি বলত? তোমার জ্ঞান কতটুকু বলত? একটী পরমাণুর বিষয় ভাব, অকূল বিস্ময়ে ডুবিবে। জান কি যে, এত অহঙ্কার কর? একটী সামান্য মানুষের কথা ভাব, অবাক্ হইবে। পৃথিবীতে কত বেদ পুরাণ অভ্যুদিত হইয়াছে, কত যোগী ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন বা আছেন, সে কিছুই জান না। জান না, নিজকে নিজে, নিজের দেহে, নিজের মনে যাহা আছে, তাহাও তুমি জান না। কোথায় ছিলে, জান না; কোথায় চলিয়াছ, তাহাও জান না। তোমার লক্ষ্য কি, জান না; তোমার উদ্দেশ্য কি, জান না। কি জন্য আসিয়াছ, জান না; কি করিতেছ, তাহাও জান না। কল্য তোমার পরিণাম কি হইবে, তাহাও জান না। নিজের কথা স্থিরচিত্তে নিজে ভাব, অবাক্ হইয়া যাইবে। কোন চিন্তার সীমা নাই, কোন কাজের পরিসমাপ্তি নাই। এইটুক ভাবিয়া ফেলিলেই চিন্তার শেষ হইবে, বলিতে

পার না; এইটুক করিয়া ফেলিলেই হাতের কাজ সমাপ্ত হইবে, বলিতে পার না। ভাব বুঝিবে, কোন কিছুরই শেষ নাই, সব যেন অনন্ত। অনন্ত ভিন্ন—আর অন্ত খুঁজিয়া পাইবে না। জ্ঞানের অনুসরণ কর, অন্ত পাইবে না, প্রেমের পথে চল, অন্ত পাইবে না। সান্ত যাহা, ঐ দেখ, তাহা মরিয়া গিয়াছে; এ রাজ্যে এখন যেন কেবল অনন্তেরই উদ্ভব হইয়াছে। সব ভুলিয়া, আত্মাকেও ভুলিয়া একবার অনন্তে ডুব দেখি, কি সুখ, বুঝিবে।

"আমি" বেটার দৌরাত্ম্যে পৃথিবী উচ্ছন্ন গিয়াছে। "আমার জ্ঞান, আমার ভক্তি, আমার শক্তি, আমার মুক্তি।" "আমি করি" "আমি বলি"—চতুর্দ্দিকে এই রব! "আমি" সীমায় বদ্ধ থাকিলে, পৃথিবীর সবই সীমাবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কেননা, সীমার ভিতরে থাকিয়া অসীমকে দেখা যায় না। যখন "আমিত্ব" বিসর্জ্জিত হয়, তখন সব সীমা অন্তর্হিত হয়—ক্ষুদ্র দৃষ্টি অনন্তে তখন ধাবিত হয়। এই "আমি" কে, ভাই বলত? মানুষ কে? সান্ত কোথায়? আমিত্ব কোথায়? সবই যখন অনন্তে ডুবিল, তখন, "আমিত্বও" বিসর্জ্জিত হইল। কাহার আমিত্ব ডুবিল? তোমার আমার? তাহা নহে। ঈশা যখন অনন্তে নিমগ্ন হইলেন, তখন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "I and my father are one." শ্রীচৈতন্য যখন অচৈতন্য হইয়া অনন্তে ডুবিলেন, তখন বলিলেন—"মুই সেই, মুই সেই।" শাক্য যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন নিরঞ্জনা-তটে অনন্ত জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এমনই—এ দৃষ্টান্ত মানুষ দেখে না, মানুষ অহংময় সীমার ভিতরে থাকিতেই ভালবাসে। সে ডুবিয়াও, ফিরিয়া ঘুরিয়া, আবার অহং-প্রাচীরময় রাজ্যে উপস্থিত হয়। এক এক বার সে যায় অনন্তপুরে, কিন্তু আবার ফিরিয়া গণ্ডির ঘরে প্রবেশ করে। ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা, ইহাই অন্ধকার, ইহাই সান্ত। এই-খানেই সম্প্রদায়ের উদ্ভব, এইখানেই পাপ প্রলোভন, এইখানেই যশ মানের কুহক, এইখানেই বিবাদ বিসম্বাদ। এইখানেই দলাদলি রক্তারক্তি, এইখানেই পাপাসুরের রাজত্ব, এইখানেই সঙ্কীর্ণতা, অপ্রেম ও কুজ্ঞান, এইখানেই সংসারাসক্তি। অহঙ্কার নামক যে একটা সয়তান মানব পরিবারকে অনন্তের পথ হইতে সান্তের দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সয়তান এইখানেই বসবাস করে। সে মানুষকে বুঝাইয়া দেয়, আর কিছুই নাই, কেবল "তুমিই আছ!" "তোমার সমান নাহি আছে ত্রিভুবনে"—অহঙ্কারের শিক্ষা এইরূপ। অহং-পুরের দাস দাসী, ইহার চরণতলে বসিয়া পাপ-গরল

পান করে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। সান্তেই আরম্ভ, সান্তেই পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির পরিণতি, এই সয়তান ইহা মানুষকে বুঝাইয়া দেয়। এই সয়তানের হাত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন, মায়া ও অবিদ্যার কুজ্‌ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিকে বিশাল উদার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে—সম্প্রদায় নাই, দেশ নাই, রেখা নাই, দিন নাই, সব এক অবিনাশী অনন্ত শক্তিরই বিকাশ। তখন তাঁহারা দেখেন, সামান্য অবিনাশী জড় পরমাণুর ভিতরে এক অবিনাশী অনন্ত চিদ্‌ঘন আনন্দ শক্তি মূর্ত্তিমান। এখানে কেবল বিশ্বজনীন ভাব,—উদারতার পর উদারতা, মহা উদারতার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। যাহা দেখা যায়, সে সকল কেবল অনন্তের কথাই প্রকাশ করে। যাহার দিকে চাওয়া যায়, সেই এক অননুমেয় অনন্তের আভাস দেয়। ফুল হাসে, পাখী গায়, নদী চলে, ঝরণা কুলকুল ধ্বনি করে—সবই সেই অনন্তের কথা প্রকাশ করে। সান্ত ভৌতিক প্রকৃতি যখন অনন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে—ভেদাভেদ যখন চলিয়া গিয়াছে, তখনই অনন্তের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। তখন মানুষ দেখে,—চন্দ্র সূর্য্য অনন্ত গগনে অনন্তেরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে; অনন্ত নক্ষত্র-জগৎ অনন্তের কীর্ত্তিই প্রচার করিতেছে, আর এই সসাগরা পৃথিবী অনন্তের কথাই বিঘোষিত করিতেছে। এই উচ্চ ভূমিতে মানুষ যখন দাঁড়ায়, তখন মানুষ নিজশক্তির মূলে কেবল অনন্ত শক্তি অনুভব করিয়া দেবত্ব লাভ করে। তখন বিশ্বামিত্রের বাহুবল পরাস্ত হইয়াছে, বশিষ্ঠের বুদ্ধিবল হার মানিয়াছে, বাল্মীকির ধর্ম্ম ও চরিত্র-বল স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া জগতে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে, অনন্ত পরিবার গঠনে সক্ষম হইতেছে।* অথবা খ্রীষ্ট তখন পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য "আমিত্ব" ক্রুশকাষ্ঠে বলি দিয়া অনন্তের পরিবার গঠনে সহায় হইয়াছেন, অথবা শাক্য কঠোর তপস্যায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অনন্তের কীর্ত্তি জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য অনন্তে ধাবিত হইয়াছিল, অনন্তেই তাঁহাদের কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তি অনন্তকাল থাকিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "Love thy enemy" শত্রুকেও ভালবাসিবে, এই উদার শিক্ষার পরও আবার খ্রীষ্টসমাজে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল কেন? অবিদ্যা, মায়া এবং অহং নামক দস্যুর পরাক্রম এ জগতে অজেয় বলিয়া

* বাল্মীকির জয়—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত—পাঠ কর।

এখনও আমরা এই রাজ্যে বাস করিতেছি। আমরা বুঝি না, অনন্ত ধারণা করি না। আমরা নিশ্চিন্ত। আমরা উদাসীন। অহং-সেবাই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। সান্তের ক্রোড়ে আমরা সর্ব্বদা শয়ান। হায়, ভুজবলে, বুদ্ধি-বলে (Physical force, Intellectual force) আমরা জগতে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর। আমাদের বশিষ্ঠ বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন, ভাবিতেছেন; আর আমাদের বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, "বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি, বাকীটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।" কিন্তু এই সময় বাল্মীকি কাঁদিয়াই আকুল, দারুণ অনুতাপে অন্তরের সব ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন! জয় কাহার? বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যখন দেহত্যাগ হইল, তখন—

"ব্রহ্মা বাল্মীকিকে স্বর্গ যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারাপ্লুত নয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম, আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু! * * * এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মণ! যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে।" ইত্যাদি কথা বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মা বলিলেন—"নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ কর।" বাল্মীকি দেখিলেন, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান কনককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময় বপুঃ শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক বক্ত্র, অনেক নেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশিসূর্য্য নেত্রে দীপ্তহুতাশবক্ত্র, শরীর প্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ব্রহ্মাদি সকলে, মানব জীব জন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিলীন রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বিরাটমূর্ত্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ ত তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—"বাল্মীকি! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও একতা গাহিয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাট স্বরে ধ্বনি হইল "জয়"।

যাহা বলিবার, শেষ হইয়াছে। সান্ত আর কিছুই নহে, অনন্তের সিঁড়ি। অথবা সান্ত আর কিছুই নহে, অজ্ঞান মানুষকে অনন্তে লইয়া যাইবার সহজ উপায়মাত্র। অনন্তই সান্তরূপে মানুষকে অনন্তে পৌছাইতেছে,—আকারের ভিতর দিয়া নিরাকারে, ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া মহতে লইয়া যাইতেছে। অনন্ত সাগরতীরে দাঁড়াও, কতকদূর দেখিতে পাইবে, তার পর আর দৃষ্টি চলিবে না। অনন্ত প্রসারিত আকাশের দিকে বা প্রান্তরের দিকে তাকাও, সীমা তোমার চক্ষুকে বাধা দিবে, সকল অংশ দেখিতে দিবে না। আকাশেও সীমা, প্রান্তরেও তোমার নয়ন সীমা দেখে! প্রকৃতপক্ষে যেখানে সীমা নাই, সেখানেও সীমা বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে সমস্ত পদার্থই অনন্ত হইয়াও সীমাবদ্ধভাবে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ধীরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, অন্ত কিছুরই নাই, সবই অনন্ত, উহা মানুষের দৃষ্টি বা ধারণা শক্তির বাধামাত্র, অথবা মানুষকে অনন্তে পৌছাইবার সিঁড়িমাত্র। অহঙ্কার, মায়া, অবিদ্যা মানুষকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায়; কিন্তু যখন দিব্যজ্ঞান জন্মে, তখন সবই অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। অনুতাপানলে* অহংকে ভস্ম করিয়া পাপী-বিমুক্ত বাল্মীকি অনন্ত তত্ত্ব পাইয়া বিধাতার জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যতদিন সেইরূপ অহং ভস্ম করিতে না পারিব, যতদিন মায়া ও অবিদ্যার উপরে উঠিতে না পারিব, ততদিন অনন্ত বুঝিব না, গণ্ডির মধ্যেই মরিব ও পচিব, অনাবিল অহেতুকী প্রেম ও পুণ্যের আস্বাদন পাইব না। যতদিন মানুষ অহঙ্কারের রাজ্যে বাস করে, ততদিনই সান্ত দেখে, সান্ত ভাবে; আর যখন অহংকে ভস্ম করে, আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়, তখনই অনন্তের ছায়া সর্ব্বঘটে বিরাজিত দেখিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হয়। অনন্তের আভাস যখন মানুষ পায়, তখন পাপদেহ ভস্ম করিয়া মানুষ উদার বিশ্বজনীন ধামে পৌছিয়াছে। তাহাই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ, তাহাই অবিদ্যা-বিমুক্ত মুক্তিধাম।

---

* বাল্মীকির জয় ৯২, ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।



৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই।

প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র।

"Great geniuses have the shortest biographies. Their cousins can tell you nothing about them. They lived in their writings and so their house and street life was trivial and commonplace. If you would know their tastes and complexions, the most admiring of their readers most resembles them."—*Emerson.*

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভাষা-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। ইহাকে মহাত্মা রমেশচন্দ্র "রামমোহন-যুগ" নাম দিয়াছেন। এই শতাব্দীর সমস্ত লোক-সাগর ছাঁকিলে আমরা ৫টী অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাই,—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ঘটনা রামমোহনের অভ্যুত্থান ও তিরোধান, মধ্যের ঘটনা মাইকেল, কেশবচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান ও তিরোধান, আর শেষ ঘটনা—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। রামমোহন জ্ঞানবুদ্ধিতে, মাইকেল কবিত্বে, কেশবচন্দ্র প্রতিভা ও ভক্তিতে, বিদ্যাসাগর প্রেমে এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভায় এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস ইঁহাদেরই কার্য্যকলাপে পূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির মূল ইঁহারাই। ধর্ম্ম-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, সকলই ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহারাই জাতীয় উন্নতির মূল। ইতিহাস এবং ভাবীবংশ অবশ্য এ সকল কথার সুবিচার করিবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান, একথা ভাবিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হয়, প্রাণ শোকে, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। কি অপরাধে, সোণার বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম্ম-প্রচার ও সাহিত্য-সেবার মায়া পরিত্যাগ করিলেন, জানি না! তিনি কথা প্রসঙ্গে এক দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যার যা ইচ্ছা লিখিতেছে, এবং করিতেছে, ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।" এই দুঃখেই কি মহাত্মা অসময়ে প্রয়াণ করিলেন? ৩০ বৎসরাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন, এবং কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে ধর্ম্ম-সংস্কারের তিনি অজেয় নেতা ছিলেন,

তাহা কি তিনি জানিতেন না? তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ যে সম্রাটহীন এবং নেতাহীন হইবে, তাহা কি তিনি বুঝিতেন না? তবে কেন গেলেন, কেন কাঁদাইলেন? আকুল প্রাণে মহাশ্মশানে, মহাধ্যান-মগ্ন মহাযোগীকে একথা, ২৬শে চৈত্র, রবিবার, জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উত্তর পাই নাই। যখন দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত চিতায় মহাত্মার প্রতিভা-প্রদীপ্ত শরীর ভস্ম হইতে লাগিল, এবং সেই স্থানের অমূল্য পরমাণু-মিশ্রিত প্রতপ্ত বায়ু শরীরকে পবিত্র করিতে লাগিল, তখন আকাশের দিকে চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে, মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "দেব, কেন যাও, কোথা যাও?" কিন্তু উত্তর পাই নাই। তখন বুঝিলাম, তিনি গিয়াছেন, আর নাই; তখন বুঝিলাম, তিনি বঙ্গদেশের মমতা চিরকালের জন্য ভুলিয়াছেন। হা বঙ্গদেশ, হা বঙ্গভাষা!!

এই প্রবন্ধের শিরোদেশের উদ্ধৃতাংশে মহাত্মা এমারসন প্লেটো সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় জীবন-কাহিনীতে নয়, সৌন্দর্য্যগ্রহণে, পুস্তকের চরিত্র-সৃজনে ও কষ্টসহিষ্ণুতাতে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একথা খুব খাটে। এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য, দশ বিশ কথায় সমাপ্ত, কিন্তু ভিতরের জীবন অমৃতের উৎস। তিনি তাঁহার লেখাতে, চরিত্র-সৃজনে, কষ্টসহিষ্ণুতাতে, সৌন্দর্য্য-গ্রহণে এবং উদার ধর্ম্মমতে যে অসাধারণ প্রদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল তাহা মানব মনকে অনুপ্রাণিত করিবে;—তাহা অবিনশ্বর, অনন্তগর্ভ, অতুল সৌন্দর্য্যের আকর। সে সকল কথা এক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসাধ্য। সে চেষ্টার সময়ও এ নয়। আজ সংক্ষেপে তাঁহার অমানুষী শক্তির কথা কিছু লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ়—মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৫ বৎসর পরে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার যে চারিটী সন্তান পিতৃকুল পবিত্র করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তন্মধ্যে তৃতীয়। ভ্রাতাগণের মধ্যে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন রহিলেন, কেবল পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিভার রাজা, বাল্যেও সে প্রতিভার খুব পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ৫ বৎসর বয়সের সময় এক দিনে তিনি বর্ণমালা শেষ করিয়াছিলেন। ১২৫২ সালে ৭ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র

মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১২৫৭ সালে তাঁহার পিতা ২৪ পরগণায় বদলী হইলে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। কাঁটালপাড়া হইতে হুগলি পড়িতে যাইতেন। এই কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ, রঘু, ভট্টি ও মেঘদূত শেষ করেন। তিনি ৪ বৎসর টোলে পড়িয়াছিলেন। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ৮।৯ বৎসরের পরে স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি ১৯।২০ বৎসর বয়সে কাঁথিতে পুনঃ বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম সূর্য্যমুখী। যখন হুগলি কলেজে পড়িতেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ৺ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী কবিতা লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে, এদেশে সর্ব্বপ্রথম বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন অধ্যয়ন করিতে তাঁহার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আগমন, কিন্তু তাহা আর সম্যক্‌রূপ হইল না। সেই সময়ের গুণগ্রাহী লেঃ গবর্ণর হেলিডে সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। শুনা যায়, কলেজে সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শী ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহর গমন করেন। এখানে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ৭ মাস পর তিনি কাঁথিতে এবং এক বৎসর পর কাঁথি হইতে খুলনায় বদলী হন। খুলনা তখন যশোহরের একটী মহকুমা ছিল। নীলকর মরেল্ সাহেবের অত্যাচার দেশবিখ্যাত ছিল। তিনিই এই অত্যাচার দমন করেন এবং কলিকাতা হইতে খুলনা যাওয়ার পথে যে ভীষণ ডাকাতের দল লুটপাট করিত, তাহা নির্ম্মূল করেন। খুলনা হইতে বারুইপুর বদলি হইলেন। এই সময়ে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার কয়েক মাস পরে বহরমপুরে গমন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাঙ্গলা দপ্তরের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন। এখানে মেকলে সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয়। তাঁহার সহিত বনিবনাও না হওয়ায় পুনঃ ডেপুটীগিরিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আলীপুরে অবস্থিতি করেন। এখানে থাকা সময়ে কমিসনার মনরো সাহেবকে এক দিন সেলাম না করায়,

তাঁহার প্রতিকূল আচরণে জাজপুরে বদলী হন। সেখানে পৌঁছিবা মাত্র সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকে হুগলীতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। হুগলীতে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া আলীপুরে পুনঃ বদলী হন। শেষ পর্য্যন্ত এখানেই ছিলেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

যখন তিনি খুলনায় ছিলেন, তখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কিশোরী চাঁদ মিত্রের Indian Field নামক পত্রিকায় "Rajmohan's wife" নামক উপন্যাস ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আপন ভুল বুঝিয়া ইংরাজি লেখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। খুলনা থাকিতেই দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে আরম্ভ করেন, বারুইপুরে থাকার সময়, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, তাহা প্রকাশ হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী প্রকাশ করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ—১২৬৯ সালে, বহরমপুর থাকার সময়ে বঙ্গদর্শন প্রচার আরম্ভ করেন। ১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ও সাম্য, ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়, ১২৮১ সালে রজনী, ১২৮০।৮১।৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৫ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭, ১২৮৮ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হয়। দেবী চৌধুরাণীর কতকাংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পর দুই তিন খানি পুস্তকের উপক্রমণিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচরিত্রের প্রথমাংশ 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে বাহির হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত বাহির হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নবজীবনে, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচারে' গীতাধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ বিবিধপ্রবন্ধ, লোক-রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গদ্যপদ্য নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সময়ে আরো কত কি লেখা বাহির হইবে, কে জানে? পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তাঁহার "ললিতা" ও "মানস" কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর পুত্র নাই, ৩টী মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। একটী কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি দারুণ মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন; এখন তাঁহার ২টী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান। জীবনের শেষ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর এবং সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ভাল করিয়া বাঙ্গলা ভাষার পরিচার্য্যা করিবেন, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেইরূপ কাজ

আরম্ভও করিয়াছিলেন, ইন্দিরা ও রাজসিংহ আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গীতা-ব্যাখ্যা শেষ করিতে পারিলেই তাঁহার মহা জীবনের মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত। কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। ভ্রাতৃবিয়োগে, কন্যার শোকে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর দারুণ বহুমূত্র রোগ তাঁহার শরীরের রক্ত-শোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। যখন কেহ কিছু জানে না, তখন তাঁহার ভিতরে ভিতরে ভয়ানক রোগের আধিপত্য প্রকাশ পাইতেছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে যুবকদিগের উচ্চ নীতি-শিক্ষা-সভার বেদসম্বন্ধে তিনি যখন বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই, অসময়ে বঙ্গ প্রদেশে অশনিপতন হইবে। তিনি আত্মপ্রকাশে সর্ব্বদা সংযত ছিলেন। অল্প-জ্ঞানী বুদ্ধিহীনদিগের ন্যায় বাহ্য-প্রকাশ-পিপাসা তাঁহার কখনও ছিল না। * সুতরাং নিকটস্থ বন্ধুগণ ভিন্ন কেহই তাঁহার ব্যাধি-বৃদ্ধির সংবাদ পায় নাই। যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পীড়ার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার অন্তিমশয্যা। ২৬শে চৈত্র রবিবার হঠাৎ কলিকাতার রাস্তায়, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় প্রকাশ হইল, বঙ্কিমচন্দ্র নাই। সংবাদ শুনিবার একটু পরেই শুনিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের শব কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছে। যে অবস্থায় ছিলাম, ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম, সঙ্গে অধিক লোক নাই। শেষে ক্রমে ক্রমে কিছু লোক সংগ্রহ হইল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার অল্প পরেই দেখিলাম, অনেক লোকই চলিয়া গিয়াছেন। দেশের গণ্য মান্য লোক বড় একটা দেখিলাম না। ক্রমে ক্রমে আত্মীয় স্বজনের দ্বারা শেষ আয়োজন হইল—বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র শরীর শ্মশানে শেষবার স্নাত হইলে মুখে শেষ-অন্ন প্রদত্ত হইল, তারপর ধীরে ধীরে চিতায় মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—মহাত্মার অমূল্য শরীর নিমেষে নিমেষে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বশরীর ভস্ম হইল, পাষাণবৎ দাঁড়াইয়া যেন ভেল্কি দেখিতে লাগিলাম। কি বিষাদময় দৃশ্য, কি মর্ম্মভেদী ঘটনা! এদেশের শেষ গৌরব, শেষ কীর্ত্তি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আগুন, শেষ প্রতিভার চিতা নিবিল। এদেশের গৌরব করিবার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে

---

* মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, —"His learning was vast, but it was never displayed. It always went into the bottom of his faculty, sank into the bosom of his soul, and there produced the culture for which we all admire. Most young men, some of them of brilliant powers, have a greater hunger to make a display of the literary learning they have scraped together, and it is in the nature of these fatal tendency that it leads to the subversion of the substance that has been gathered together and the student is an empty-headed fool."

হারাইলাম। শেষে—শেষে বিজয়াদশমীর পর কাঁদিতে কাঁদিতে, একাকী, অবসন্ন হৃদয়ে, বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে ফিরিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন এই খানেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা এখানে সমাপ্ত নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত প্রতি শব্দে, প্রতি ছত্রে, প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি পুস্তকে তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত, অঙ্কুরিত। অনন্তরূপে, অনন্তভাবে, অনন্ত ভাষায় তাহা অনন্তকাল পরিস্ফুট হইবে, ব্যাখ্যাত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার জন্য শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, দেখিয়া কিছু পরিতৃপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু ইহা এই মহাত্মার অমানুষী শক্তির উপযোগী পূজা নহে। কেহ কেহ আপন আপন পথ বাঁচাইয়া কথা বলিতেছেন। কবে তাঁহার চরিত্রে কি দোষ ছিল, এই সময়ে কেহ সে দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন, কেহ বা, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, একথা ঘোষণা করিয়া উদারতা প্রকাশ করিতেছেন! কেহ প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের, কেহ বা উপন্যাস অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের, কেহ বা সকল অপেক্ষা তাঁহার সমালোচনা শক্তির অধিক প্রশংসা করিতেছেন। আমাদের দেশের সম্পাদকগণের মধ্যে অসাধারণ চিন্তাশীল নেশন-সম্পাদক লিখিয়াছেন; 'বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গতি বিভিন্ন দিকে থাকিলেও, উপন্যাস-লেখক বলিয়াই তাঁহার নাম থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম ও সামাজিক দর্শন সম্বন্ধীয় মতের কেবল গঠন আরম্ভ হইয়াছিল।'*

বিজ্ঞ সম্পাদকের এ কথা আমরা স্বীকার করি না। নেশন-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক সকল পড়িয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। আমরা ক্রমে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইব, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ভাষা সংস্কারে এবং উদার ধর্ম্মমত প্রচারেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তাঁহার অপেক্ষা কালে ভাল উপন্যাসকার বা সমালোচক আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুচিন্তাশীল পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তিনি প্রথম উপন্যাস-লেখক এবং বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। একথা তিনি নিজেই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।† আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দী

* "Baboo Bankim Chandra had a manysided mind and a varied activity, but it is a novelist that he will live."
"Baboo Bankim Chander's views on religion and social philosophy to have been in the course of formation." *Indian Nation* Vo. LXII. No 16. 1894.

† লুপ্ত রত্নোদ্ধার দেখ।

সমালোচন কালে দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান বাঙ্গালার স্থষ্টিকর্ত্তা ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু তা হইলে কি হয়? বর্ত্তমান ভাষার স্থষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন, বর্ত্তমান ভাষার জীবনী শক্তি কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র। এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিত না কে? এখনই বা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা করে না কে? জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন ভিন্ন, জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এ কথা এদেশের কয়জন দেশহিতৈষী মানেন? কেশবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা আদরের জিনিস; বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ভিন্ন এ পতিত জাতির উদ্ধারের অন্য পথ নাই। তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় নিয়োগ হওয়ায় ভাষার গৌরব—দেশের গৌরব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা অমর হইয়াছেন। ইংরাজিভাষায় কোন্ গ্রন্থের অভাব আছে? বিদেশীয় কোন্ লোক ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া সেক্ষপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, স্কট, ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন? হওয়া সম্ভব কি? যাহারা ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে চান, তাঁহারা মহাভ্রান্তিতে নিমগ্ন। বঙ্কিম বাবু অত্যাশ্চার্য্য প্রতিভাবলে এ কথা বাল্যেই বুঝিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মহাশিক্ষা তাঁহার ভিতরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের জীবন তাঁহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। আমাদের বন্ধু বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সাহিত্য-মঙ্গল" নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেশব ও বঙ্কিম উভয়ের সাহিত্য-জীবন উভয়ের ধর্ম্ম জীবনের-কারণ; অথবা উভয়ের ধর্ম্ম-জীবন, সাহিত্যজীবনের কারণ। দেখাইয়াছেন, উভয়ের জীবনে খুব সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ভিন্ন এদেশের উদ্ধার নাই, এদেশের ধর্ম্ম জাগিবে না। এজন্যই উভয়ে এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের সেবকের নিবেদন, জীবনবেদ ও ব্রহ্মগীতোপনিষৎ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত এদেশের সহজ, সতেজ ভাষার চরম নিদর্শন। এই জন্যই, এই উভয়কে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রতিভাশালী লোকের লক্ষণ কি? সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে পারেন না, কাহারও মতানুসরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদাই এমন পথে বিচরণ করিতে চান, যে পথে কেহ কখনও পদনিক্ষেপ করে নাই। অথবা যে পথে অন্য

লোকেরা অন্ধকার দেখেন, সেই পথে তাঁহারা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পান। তাঁহারা গুরু মানেন না, নেতা মানেন না, শাস্ত্র মানেন না, দেশাচার মানেন না। তাঁহারাই নেতা, তাঁহারাই শাস্ত্রকার, তাঁহারাই গুরু। তাঁহারা যে কথা বলেন, পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করে, অনুসরণ করে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ-কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা। তাঁহার জীবনবেদ পড়িয়াছেন, তাঁহারা, শত্রু মিত্র সকলেই, একবাক্যে স্বীকার করিবেন, তিনি ঈশ্বরকে মানিতেন বলিয়া আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পারেন নাই। তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া যখন ছিন্ন ভিন্ন হইল, তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, যাহা বুঝিয়াছিলেন, অটল ভাবে তাহা ধরিয়াছিলেন। লোকে আঘাত করিয়াছে, নিন্দা করিয়াছে, তিনি বিধাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অটল, নির্ভীক, অনুত্তেজিত। দল বাঁধিতে চাহিলে তিনি বাঁধিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—"গুরুগিরি কখনও করি নাই, কখনও করিব না। কাহাকেও আপন পথে চালাইব না। * * এক জনকে মানি বলিয়া আর কাহাকেও মানিব না।"* বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সর্ব্বথা একথা খাটে। তাঁহার "সাম্য" নামক পুস্তকে তিনি যে সকল অমূল্য কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রভাতকালীন উজ্জ্বল প্রতিভার এই অসাধারণ লক্ষণ পরিস্ফুট ; আর প্রকাশ—ধর্ম্মতত্ত্বের ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে। সমস্ত পুস্তকখানি তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে ; একটী স্থান দেখাই।

"শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না ?

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য ; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ?

গুরু। কেন করিব না ? ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠগুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক্ ; কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মত।" ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৩২ পৃষ্ঠা।

প্রতিভার দ্বিতীয় লক্ষণ, মতের স্থিরতা ; তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাঁহাদের মত মিনিটে মিনিটে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহারা প্রকৃত প্রতিভাশালী

* জীবনবেদ, "স্বাধীনতা" দেখ।

লোক নহেন। মহতের মহত্ব এইখানে, তাঁহারা যাহা বুঝেন, তাহা জীবন বিসর্জ্জনেও পরিত্যাগ করেন না। অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস, দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই তাঁহাদিগকে পদস্খলিত করিতে পারে না। খ্রীষ্ট অবিচলিত, গ্যালিলিও অবিচলিত, ম্যাট্‌সিনি অবিচলিত, রামমোহন অবিচলিত, কেশবচন্দ্র অবিচলিত, বিদ্যাসাগর অবিচলিত, গ্লাডষ্টোন অবিচলিত, এবং আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার নিন্দা বা উপহাস করে নাই, এমন লোক বিরল ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লেখা বুদ্ধিহীনের কাজ, সহজ বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা মূর্খের কাজ;—অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের এই ধারণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কঠিন সমস্যার সময় অবিচলিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষা আজও বিকৃত হইয়া থাকিত। এই অবিচলিত ভাব তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত। একদিকে প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী এক প্রবল দল, অপর দিকে নবীন পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুন্নতির পরিপোষক দল, ইহার মধ্যে বীর বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকচিত্তে সাম্যের উদার মত লিখিতেছেন; কৃষ্ণচরিত ও গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং ধর্ম্মতত্ত্বের কঠিন মীমাংসা করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মমত যে অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত, তাহা তাঁহার সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় মতে শেষবার পরিব্যক্ত। কেশবচন্দ্র যে আমরণ আপন মত পরিত্যাগ করেন নাই, সকলেই জানেন; ঈশ্বর, মানব-পরিবার, পরকাল, আদেশবাদ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার এক মত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেরও মত অক্ষুণ্ণ। আমরা তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় মত-সম্বলিত পত্রখানি ১২৯৯ সালের ২৩শে শ্রাবণের সঞ্জীবনী হইতে আমূল তুলিয়া দিলাম।

"অশেষ গুণ-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্ব্বাদভাজনেষু।

আপনি আমাকে যে কয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং [illegible] প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত [illegible] বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার [illegible] সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া [illegible]

তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালি সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময় লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি ভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করান যায় না।

আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন, শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি. ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র যাত্রায় সমাজের কাহারও আপত্তি থাকিবে না; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র যাত্রা সাধারণের মধ্য প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে বাঙ্গালি সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্র যাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে, ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালি সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্ রাখেন। যাঁহারা

ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজ-সম্মত ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সম্মত, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে ;—

"ধারণাদ্ধর্ম্ম নিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ-প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"
কর্ণ-পর্ব্ব একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর, তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্র যাত্রা পদ্ধতি লোক হিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও, কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে,—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতি-শয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্তঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহা-দিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র যাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাই থাকুক, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।"

কলিকাতা
২৭শে জুলাই, ১৮৯২।

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রচারে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র এবং শশধর তর্কচূড়ামণি যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার

করিতে নিযুক্ত, আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে না।"* আর সেই কথা ১২৯৯ সালে পুনঃ বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। এই পরিচয় তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায়, তাঁহার বেদ ব্যাখ্যায়, † তাঁহার কৃষ্ণচরিত ব্যাখ্যায় আরো স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। ইচ্ছা আছে, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিব। কিন্তু সে ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবে কি না, বিধাতাই জানেন। এইরূপ উদার মত ঘোষণায় তাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই, আমরা তাহা মনে করি না। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, স্বাধীন মত ঘোষণা করিয়া যাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহার কথার আভাসে এ কথার পরিচয় পাইয়াছি, আর পরিচয় পাইয়াছি—এই ধর্ম্মধ্বজী চটুল ব্যক্তিগণের বাক্যবাণে, নিন্দাঘোষণায়। সে সকল কথারও বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না; তাহা জীবনীলেখকের কাজ। আদেশের মত প্রচার করিয়া কেশবচন্দ্রকে যেরূপ নির্যাতন ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইঁহাকেও তদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন জীব, প্রতিভার খনি, তিনি কখনও পদস্খলিত হইবার নহেন। তিনি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে উদার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।" সঞ্জীবনী, ২৩শে শ্রাবণ, ১২৯৯।

বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতাকে প্রতিভার অন্যতর লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡ এ লক্ষণ বঙ্কিম বাবুতে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। কলেজের সহিত এ দেশের কৃতবিদ্যগণের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়, ইহা এদেশের প্রসিদ্ধ কথা। কর্ম্মক্ষেত্রে

---

* প্রচার, শ্রাবণ, ১২৯১—১৫ হইতে ২১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

† University Magazine, March 1894, P. 41-44 & April P. 55-60.

‡ প্রতাপ বাবুর বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেখ;—National Guardian, April 15, 1894, P. 3.

প্রবেশ করিয়া, সাধারণতঃ, এদেশের কৃতবিদ্যগণ, তাস পাশা খেলিয়া, বৃথা আমোদে মাতিয়া সময় কর্ত্তন করেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবু তাহা করেন নাই। পাঠ্যাবস্থা হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পাঠেই তাঁহার জীবনের আরম্ভ, পাঠেই জীবন শেষ। তিনি চিরদিন ছাত্র। জীবনের শেষ যুগে গীতা অধ্যয়ন করেন; সমগ্র মহাভারত তারও পরে। পাঠের পিপাসা এতদূর বলবতী ছিল, পাঠের সময় যাইবে বলিয়া প্রায় কখনও কোন প্রকাশ্য সভায় যাইতেন না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মক্ষেত্রের গাধার খাটুনি খাটিয়া, এদেশের আর কোন্ ব্যক্তি সাহিত্যকে এত অপরূপ বেশ ভূষায় উজ্জ্বল করিয়া যাইতে পারিয়াছেন? তাঁহার দিবা রাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিন্তার ফল, তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাশি। তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি এদেশে আর দেখা যায় না। এইখানেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ, সৌন্দর্য্যানুভূতি। আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখি, তাহার ভিতরেই প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখেন। ফুল ফলে, চন্দ্র সূর্য্যে, পাহাড় পর্ব্বতে, নদী ঝরণায়, সাগর উপসাগরে, এবং নরনারীর মুখশ্রীতে তাঁহারা এক অলৌকিক বিমল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন। যে সকল ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তাহার ভিতর হইতেই তাঁহারা অনন্ত সৌন্দর্য্য বাহির করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, প্রতাপ, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, রোহিণী প্রভৃতি চিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর ও সাম্য, ঘটনারাজ্যের কর্ম্মক্ষেত্রের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের আকর। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, এই সৌন্দর্য্য, বিশ্লেষণে, আরো পরিস্ফুট হইবে, আরো উজ্জ্বল হইবে। বঙ্কিমের ভাষা কাব্যের উপযোগী নয় বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভুল কথা। হৃদয়ের ছবি যে ভাষায় অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারা যায়, সেই ভাষাই প্রকৃত ভাষা। আর যে ভাষা তাহা পারে না, তাহা শব্দাড়ম্বর, অলঙ্কারের ছটামাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সহজ, সরল, সরস, আড়ম্বরবিহীন হৃদয়ের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ মনে করিয়াছেন, নিজমত সেইরূপে অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এদেশের নর নারীর মধ্যে এমন পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইয়াছেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন,—ভাষা এই মরজগতে এক অক্ষয় অমর

শক্তি ; এই শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার সাহায্যে না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। ঘরে ঘরে তাঁহার নাম, তাঁহার ভাষা সহচরীর ন্যায় প্রচার করিয়াছে ;—বিদ্যুৎবেগে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর পুস্তকরাশি বাঙ্গালার নর নারীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তিনি যদি বিদেশের কাহিনী অনুবাদ করিতেন, কখনও এরূপ হইত না। যে সকল ঘটনা সর্ব্বদা ঘটে, যে সকল চিত্র সর্ব্বদা দেখা যায়, তাহারই ভিতর হইতে তিনি এমন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া সকলে অবাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার অন্যতর পরিচয় এইখানে। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া মানুষ মজাইয়াছেন। একবার হাসাইয়া, একবার কাঁদাইয়া, একবার উঠাইয়া, একবার বসাইয়া, মানবরাজ্যে তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবিস্তার করিয়াছেন। ভাষা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় তাঁহার হাতে কাজ করিয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ, তাঁহার রচনাচাতুর্য্য—ঘনিষ্টযোগে সম্বদ্ধ। তাঁহাকে অনুকরণ করে নাই, এমন লেখক, তাঁহার অভ্যুত্থানের পরে আর বড় একটা দেখা যায় নাই। তিনি ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের রাজা।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ অজেয়তা। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন আর সকলকে পরাস্ত হইতেই হইবে। রামমোহন রায়ের এ শক্তি প্রভূত পরিমাণে ছিল, বিদ্যাসাগরের ছিল, কেশবচন্দ্রের ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। প্রতিযোগিতায় কেহ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা প্রতিযোগিতা করিতেন না, কিন্তু যখন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কেহ তাঁহার সহিত পারিতেন না। অনেক সময় আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার তর্কবিচার দেখিয়াছি, দেখিয়া তাঁহার শক্তির শতমুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহের সহিতই হউক, বাবু রবীন্দ্রনাথের সহিতই হউক, বা মিঃ হেষ্টি-সাহেবের সহিতই হউক, তাঁহার প্রতিভার নিকটে তর্কে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি অজেয়, তিনি অমর।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ নির্ভীকতা। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন, কিন্তু কখনও কাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন না। ইহাতে তাঁহার খুব সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের পরিচয়, কাপালিকের

সহিত সাক্ষাতে। গভীর রজনীতে কাপালিক বঙ্কিম বাবুকে সাহসের সহিত বালিয়াড়িতে যাইতে বলিতেছে, বঙ্কিম নির্ভীকভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন। কাপালিক বলিতেছে, "তোমাকে যাইতেই হইবে," বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভয়ে বলিতেছেন, "নেও দেখি ?" একবার নয়, স্থানান্তরে পুনঃ এইরূপ ঘটনা। ইহাতে তাঁহার অমানুষী সাহসের পরিচয়। খুলনার নীলকরের অত্যাচার নিবারণে ও কলিকাতা-পূর্ব্ববাঙ্গলার পথের দস্যু নিপাতে তাঁহার এই সাহস আরো উজ্জ্বল। ভয় করিয়া চলিতে হইলে, প্রতিভা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পদে পদে এই নির্ভীকতা প্রস্ফুটিত। হিন্দুসমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া, হিন্দুমত মানিয়া, হিন্দুজীবন রাখিয়া, এ দেশের আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পারিয়াছে ? ধন্য বঙ্কিমচন্দ্র, ধন্য তদীয় প্রতিভা !

প্রতিভাশালী লোকেরা যেন জগতের প্রজ্জ্বলিত আলো। প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই একটু একটু এই আলো থাকে বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লোকের বিশেষত্ব এই, তাঁহার উজ্জ্বল আলোকে যেন আর সব প্রভাবান্বিত, শক্তি-সমন্বিত। প্রতি লোকের জীবনেই তাঁহার আধিপত্য। সূর্য্য যেমন আকাশে থাকিয়া সমগ্র জগতকে আলোকিত করেন, তাঁহারা তেমনি, পৃথিবীর মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সকলকে আলোকিত করেন, সকলের মনের উপর রাজত্ব করেন। বংশ এবং জাতি পরম্পরা ক্রমে এই আধিপত্য অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে। মিল্টন, সেক্ষপীয়র, ভবভূতি ও কালিদাসের আধিপত্য জগতে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বঙ্গদেশের কোন্ প্রাণকে আলোকিত করে নাই? কাহার হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য নাই? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টিয়ান—সকলে তাঁহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাঁহার আলোকে আলোকিত। তিনি যেন সকলেরই ধর্ম্ম-গুরু, সকলেরই শিক্ষা-গুরু।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ, বহুমুখী কৃতকার্য্যতা। প্রতিভাশালী লোকেরা যে কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে এ কথা খুব খাটে। পাঠশালার অধ্যয়নে, কলেজের প্রগাঢ় শিক্ষায়, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যক্ষেত্রে এবং কাব্য জগতে সর্ব্বত্রই বঙ্কিমের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সাহিত্য জগতের কবিতা লেখায়, প্রবন্ধ রচনায়, উপন্যাসের চিত্র অঙ্কনে,

দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায়, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারে, পুস্তক সমালোচনায়, সব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতী। এখানেই প্রতিভার বিশেষ পরিচয়।

প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ নূতন সৃষ্টিতে—নূতন আবিষ্কারে। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কাহারও চর্ব্বিতচর্ব্বণ করেন নাই। তাঁহার নূতন সৃষ্টি—বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি—এ সকলই আশ্চর্য্য সৃষ্টি। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন এ সকল বর্ত্তমান থাকিবে।

তারপর নূতন সৃষ্টি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, এবং তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন-তত্ত্ব। ইহা গীতা পাঠের ফল; কিন্তু কয়জন লোক গীতা পাঠ করিয়া অনুশীলন তত্ত্বের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন? তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক নূতন আকারে জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা জানি, এ পথের নেতা তিনিই। তিনি গীতার অনুশীলন তত্ত্বের এরূপ পরিস্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কমটির প্রত্যক্ষবাদ এবং বার্কলী ও শঙ্করের মায়াবাদ অতি সুন্দররূপে বিমিশ্রিত হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে গীতা আছে, ভাগবত আছে, বেদ আছে, পুরাণ আছে, ইতিহাস আছে, দর্শন আছে; যোগ আছে, কর্ম্ম আছে; মায়া আছে, কায়া আছে; প্রেম আছে, জ্ঞান আছে;—অথবা, নাই যে কি, জানি না। ইহাতে ধর্ম্ম জগতের আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সকল তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। গুরুবাদ এবং ভণ্ডামীবাদ উপেক্ষিত হইয়া, ইহাতে চরিত্র এবং জীবনের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা যে কি অমূল্য জিনিস, এখনও কেহ বুঝিবে না। যখন মানুষের বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তরমুখী হইবে,—অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম, কর্ম্ম বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে,—যখন অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রের আদর, বাহ্যপ্রকাশ অপেক্ষা জীবনের আদর অধিক হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব, এই অনুশীলন-তত্ত্ব এদেশের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে। আমাদের সন্দেহ নাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব একদিন হিন্দুসমাজের আমূল সংস্কারের কারণ হইবে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বমুখী প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের দিকে নমিত হইয়া, এ দেশের ভাবী উন্নতির যে কারণ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাহা বুঝিবে।

প্রতিভার আর যে সকল লক্ষণ আছে, সংক্ষেপে আলোচনা করা অসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যত আবার আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু বলিয়া রাখি, প্রতিভার যত প্রকার লক্ষণ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরের চেহারায় এবং অন্তরের প্রকৃতিতে তাহা প্রস্ফুটিত ছিল। বঙ্কিমের প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা প্রতিভার পরিচয় দেয়, উজ্জ্বল নয়ন প্রতিভার পরিচয় দেয়, সুপ্রশস্ত বক্ষ প্রতিভার পরিচয় দেয় এবং সুগঠিত মস্তক প্রতিভার পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৈনিক জীবনের প্রতি ঘটনায় তাঁহার প্রতিভা প্রস্ফুট। শেষ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত-স্বস্ত্যয়নের জন্য তাঁহার কুষ্ঠীর অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, শুনিয়াছি, তিনি তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন এবং কুষ্ঠী দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই সামান্য ঘটনায়ও তাঁহার প্রতিভা পরিব্যক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের আচার ব্যবহার, গঠন প্রণালী, হাবভাব, চলা ফেরা—সব তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, তাঁহার জ্ঞান কর্ম্ম—সকলই প্রতিভার পরিচায়ক। যে দেশে কত শত রাম শ্যাম, জটা রাখিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, ভস্ম লেপিয়া, অবতার বলিয়া আজকাল প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা সফল-কামও হইতেছেন, সে দেশে, মহা প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিলে একজন মহা অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। শিষ্য জুটাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য সংগ্রহ হইত। কিন্তু তিনি মহা শক্তিশালী হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য প্রভায় এদেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া "বন্দে মাতরং" মহাসঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃপূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর এবং অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বদেশপ্রেম, নিষ্কামধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে 'প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র' উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন। কতদিন পরে, কেহ তাহা জানে না। কিন্তু সে দিন নিশ্চয় আসিবে।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩০১।

ত্রয়োদশ শতাব্দী।

"খ্রীষ্টাব্দ—১৭৯৪-৯৫—১৮৯৩-৯৪।
শকাব্দা—১৭১৬—১৮১৫।
সংবৎ—১৮৫১-৫২—১৯৫০-৫১।"

কাল আর আজ, কত ব্যবধান? কাল ৩০শে চৈত্র, ১৩০০ সাল, আর আজ ১লা বৈশাখ, ১৩০১। কাল ১৩০০ সাল সময়ের অনন্ত কোলে ডুবিয়াছে,—বৎসরের সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীও ডুবিয়াছে,আজ নূতন দিন,নূতন বৎসর, নূতন শতাব্দীর আরম্ভ। আজ বিশেষ দিনে একবার মহাকালকে স্মরণ করি।

সময়ের ছেদ, পরিচ্ছেদ, ভাল কি মন্দ, কে জানে? কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, ঘটিবে, কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, দিনরাত্রির পর দিনরাত্রি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রমাগত আসিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে। তুমি চাহিয়া দেখ বা না দেখ, তোমার সুষুপ্তি-প্রলুব্ধ নয়ন ফিরাও বা না ফিরাও—সময় কত কি সাজে সাজিয়া, কত কি রঙ্গ দেখাইয়া অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না; কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ বলিতে পারে না। সময় এবং বিদ্যুৎ—চির অনাবিষ্কৃত, চিরপ্রহেলিকাময়, চির অজ্ঞাত। উভয়ের হাবভাব, চাল্ চল্‌তি, আচার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া মানুষ জড়-ভরত, দেখিয়া দেখিয়া আরো না দেখার ন্যায় অস্তিত্ব-শূন্য। মানুষের গর্ব্ব কতটুকু?—বুদ্ধির দৌড় কত? সময়-সাগরের তীরে মানুষ গর্ব্বহারা, বুদ্ধিহারা চির-বালক। মানুষের সব গর্ব্ব এখানে খর্ব্ব, সব দর্প চূর্ণ। মানুষ জানিয়া শুনিয়াও এ তত্ত্ব সম্বন্ধে মহামূর্খ। সময়-তত্ত্বই প্রকৃত অ-দৃষ্টতত্ত্ব—কেহ দেখে নাই; কেহ গণিয়া নিরূপণ করিতে পারে নাই। বাতুল এবং অর্ব্বাচীনের প্রলাপ আমি মানি না, সময় যাহা চিত্র করিয়াছে, এবং প্রতিনিয়ত যাহা চিত্র করিতেছে বা করিবে, কেহ তাহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, পারিতেছে না, কখনও পারিবে না। কাল সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে মৃত্যু করালমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শোকের মহানির্ব্বাণে তোমাকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছে, আজ প্রাতে তুমি আবার হাসিতেছ কেন,

আজ আবার তোমার কল্যকার ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তক গর্ব্বে স্ফীত হইতেছে কেন বল ত? আমি বুঝিয়াছি, তুমি সময়ের রঙ্গ বুঝ নাই, তাই আজ ধেই-ধেই করিয়া মাতালের ন্যায় নৃত্য করিতেছ! এক দিনের, দুই দিনের জন্য তুমি সতর্ক হইতে পার না, অথচ বল যে সময়-তত্ত্ব তুমি বুঝিয়াছ! হায়, মানুষের বুদ্ধি!! কাল তুমি কাঁদিয়াছ, আজ হাসিতেছ। কল্য আবার তোমার জন্য ক্রন্দন না হাস্য, কি রচিত হইতেছে, তুমি বুঝ না, তুমি জান না। এই জন্যই আমি বলি, তুমি সময়ের দাস, দাসানুদাস। সময় তোমাকে যা ইচ্ছা, করিতেছে,—একবার উঠাইতেছে, একবার বসাইতেছে, একবার হাসাইতেছে, একবার কাঁদাইতেছে, একবার নির্জীব করিতেছে, আর এক বার সজীব করিতেছে। এ যেন "সোণার কাঠী রূপার কাঠীর" উপকথার ভেল্কি। তোমার ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার, তোমার বুদ্ধি-বিদ্যার গরিমা, তোমার ধার্ম্মিকতার শ্লাঘা, সব উন্মাদের প্রলাপ, অর্ব্বাচীনের তাণ্ডব নৃত্য, মদ্যপায়ীর উল্লাস! তুমি এ জগতে স্বাধীনতা-বিবর্জ্জিত জড়ভরত;—তুমি অ-দৃষ্ট-সময়ের অ-দৃষ্ট-চেলা। তুমি কিছু বুঝ না, তুমি কিছু জানও না।

সময় কখনও শুক্ল-বসনাবৃতা, মধুরদর্শনা পবিত্র গোপ-বালিকা; কখনও চাকচিক্যময়ী বেশ-পারিপাট্য-বিভূষিতা, নবযৌবন-সম্পন্না শ্রীরাধিকা; কখনও অগ্নিময়ী, অন্তিম-শ্মশানবাসিনী, নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনী শ্যামা; কখনও আরামদায়িনী, আসক্তিময়ী, নব নব ভাববিভোরা, প্রেম-মাতোয়ারা, করুণা-ময়ী, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা। দেখে না কে, কিন্তু বুঝে কে? মজে সকলেই, কিন্তু সতর্ক কে? নবযৌবনে যে মত্ত, সে অন্তিম শয্যার কথা ভ্রমেও ভাবে না; বিষয়-মদ্যপানে বিভোর মানুষ অহরহ সুধা বলিয়া বিষ বা মরণ-পাত্র চুম্বন করিতেছে! প্রকৃতির লীলাময়ী, মনোমোহিনী ছবি দেখিয়া আকৃষ্ট সকলেই, কিন্তু তত্ত্ব বুঝিল না কেহই, শিখিল না কেহই। মানুষ, মানুষ হইল অল্পই। কে বলিবে, সময়তত্ত্ব কত গভীর, কত প্রহেলিকাময়, কত সুন্দর, কত মনোহর!

বলিয়াছি, যাহা যায়, মানুষ তাহাও বুঝে না; যাহা আসে, সাধারণতঃ তাহাও ধারণা করিতে পারে না। যাহা যায়, তাহা যে বুঝে, যাহা আসে তাহাও সে ধারণা করিতে পারে। এই দু-ই যে বুঝে—পৃথিবীতে সে-ই মহা-পুরুষ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বালক রিয়েঞ্জি, আহত ভ্রাতার রক্ত-স্নাত রিয়েঞ্জি মুহূর্ত্তের মহীয়সী শক্তি ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি

প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "এ দিন ঘুচিবে, অত্যাচারীর অত্যাচার চূর্ণ এবং বিলাসীর বিলাস খর্ব্ব হইবে!"* তিনি যেন হাতে ধরিয়া ঘটনার পর ঘটনা রাশীকৃত করিয়া ইটালীকে স্বর্গীয় শোভায় সাজাইয়া তুলিয়াছিলেন। যে শুভ মুহূর্ত্তে লুথার বাইবেল গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে উহার পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন, "পোপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মানুষ লুথারের দুর্জ্জয় সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে; তাঁহার দুর্দ্দম্য পরাক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্ম কত সংস্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ম্যাট্‌সিনি ভজনালয়ের সোপানারূঢ় বৃদ্ধ ভিক্ষুককে যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ইটালীর উদ্ধারের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সময়, সাধারণতঃ মানুষ সৃষ্টি করে,—কখনও বা মানুষ আবার সুসময় আনয়ন করে। এই মানুষেরাই নর দেবতা। সময়ে মানুষের বিশ্বাস টলিয়া যায়, মত-শৈবাল জীবন স্রোতের প্রাবল্যে ভাসিয়া যায়—ধর্ম্মবিশ্বাস আকাশে উড়িয়া যায়—এ কথা জগতে শুনিয়া থাকি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত ধার্ম্মিক, চরিত্র বিসর্জ্জন দিয়া অধার্ম্মিক শ্রেণীতে নাম লেখাইয়াছে,—কত ধার্ম্মিক ধর্ম্মের বিমল অন্তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বহিরঙ্গনে ফোটা তিলক ভেঙ্কিরূপ নামাবলী গায়ে লেপিয়া ও জড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তপশ্চর্য্যানিরত বিশ্বাসীকে বাল্যে দেখিয়াছি চরিত্রবান্, বার্দ্ধক্যে দেখিয়াছি চঞ্চল-চরিত্র;—দেখিয়াছি, ধর্ম্ম ছাড়িয়া রিপু-সেবায়, কেহ বা যশ-সেবায়, কেহ বা মত-সেবায়, কেহ বা সম্প্রদায়-সেবায়, কেহ বা গুরু-সেবায় মাতিয়াছেন। মত পরিবর্ত্তন জগতে অহরহ দেখিতেছি। কিন্তু পুণ্যশ্লোক ঈশা মুশা, শাক্য মহম্মদ, পার্কার ম্যাট্‌সিনি, নানক কবীর, লুথার সেণ্টপলের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেহ কখনও শুনে নাই। ইহারা সময়ের রাজা, ইহারা সময়কে আত্মবশে রাখিয়া জগতকে রূপান্তরিত করিয়া অমর হইয়াছেন। বিদ্যুৎকে আত্মবলে আনিয়া যেমন মানুষ জগতের নানারূপ হিতসাধন করিতেছেন, ইহারাও তেমনি, সময়রূপ যন্ত্রবলে জগৎকে আমূল পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ইহারাই নরদেবতা, ইহারাই মহাপুরুষ। আর আমি, তুমি, সে, আমরা অহঙ্কারস্ফীত সময়ের দাস, মানবদেহে পশু-প্রকৃতি, ঘটনার তুড়িতে উঠি, বসি, চলি, ফিরি।

* See Gibbon's fall of the Roman Empire, edited by F. A. Guizot, vol. II, P. 600.

এত কথা বলিতেছি কেন? শুধু বাক্যাড়ম্বরের জন্য নয়, অবশ্য কিছু বলিবার আছে। এক একটী মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনের কত পরিবর্ত্তন করে, উপরোক্ত ঘটনায় বিবৃত হইয়াছে; এক একটী বৎসর, এক একটী শতাব্দী জগতের কত কি পরিবর্ত্তন করে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দিন, বৎসর, যুগ, শতাব্দী কত মানুষের উত্থান পতনের কারণ; আবার কত মানুষ, কত যুগ, কত শতাব্দী শোধনের কারণ। মহাত্মা ঈশা, এই ১৯ শত বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়া, ১৯ শত বৎসরকে শাসিত ও রূপান্তরিত করিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য আঘাত করিতেছেন। অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সকল মহাপুরুষেরাই এইরূপ পৃথিবী শাসন করিয়া আসিতেছেন। সে সকল গভীর তত্ত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অদ্যকার এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়। যাহা লিখিব, তাহা অতীত ত্রয়োদশ শতাব্দী সম্বন্ধে—যাহা কল্য শেষ হইয়াছে; লিখিব, মহাকালের সেই শতাব্দীর দু'দশটী কথা। কিন্তু আজ হইতে তাহা কতদূর, কে বলিতে পারে?

১১৭৬ সালের দারুণ মন্বন্তর অল্পদিন চলিয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে, ঘোর অরাজকতা দুর্দ্দম্য প্রভাবে চলিয়াছে। "জোর যার, মুল্লুক তার," এই প্রবাদ একাধিপত্য করিতেছে। মুসলমান আমলের পরিবর্ত্তে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তখনও ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন সময়ে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৮০ সালে, রাধানগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। এই বৎসর ভারতবর্ষে প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কৌন্সিল নিযুক্ত এবং এই বৎসরই সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হইল।*

এই শিশু মহাকালের এক মহাসন্তান। বিধাতার নানা সৎগুণে ভূষিত হইয়া শিশু ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। শৈশবকালে পাঠশালাতেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। বাল্যেই পারস্য ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন হইলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে পাটনার আরবী ও পার্সী শিক্ষা শেষ হইলে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। তাড়িত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে

* ৺ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৬৮ পৃষ্ঠা ও নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

উপনীত হইলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে নানা অবস্থার, নানা ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু, সন্তানের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া পিতা বুঝিতে পারিলেন, সন্তানের নবীন ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ক্রমে রামমোহন যখন কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, পিতা পুনরায় তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত করিলেন। ১২১০ সালে পিতার মৃত্যু হয়। তার পর পুনঃ রামমোহন গৃহে আসিলেন। এই সময়ে প্রকৃত রামমোহনের জন্ম হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিবেন। দেখিলেন, "চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে। সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে। এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "এই প্রথা নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।"*

নানা ঘটনার পর, ১২২০ সালে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে, চল্লিশ বর্ষ বয়সে, রাজা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। একদিকে ধর্ম্মহীনতা, অন্যদিকে অজ্ঞানতা, একদিকে অত্যাচার, অন্যদিকে চরিত্রহীনতায় কলিকাতা টলমল করিতেছিল। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না, চলিত বাঙ্গালা ভাষায় কাহারও বর্ণজ্ঞানও ছিল না। ইংরাজী যিনি লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্বান ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের অবস্থা নিম্নে লিখিতেছি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী, এবং বৈষ্ণব কবিদিগের চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হস্ত-লিখিত পদ্য পুথি সকল প্রচলিত ছিল, কিন্তু গদ্য ছিল না বলিলেই হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১২০৬ সালে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য, তদানীন্তন কালের গবর্ণর লর্ড ওয়েলেস্‌লি "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে, কতক-

* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা।

গুলি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিত হয়, তন্মধ্যে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খ্রীঃ) এবং লিপিমালা (১৮০২ খ্রীঃ) এবং রাজীবলোচনের কৃষ্ণ-চন্দ্র চরিত (১৮০২ খ্রীঃ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী, কেরী সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রধান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসনরি মার্সমান এবং ওয়ার্ড সাহেব এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে, রামায়ণ ছাপাইয়া, পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন।* ইহার পূর্ব্বে হেষ্টিংসের শাসনকালে, ডাইরেক্টরদিগের ইচ্ছানুসারে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে, বিবাহ, উত্তরাধিকার, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান ব্যবস্থানুসারে বিচার হইবে। এই নিমিত্ত হালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন (১৭৭৮ খ্রীঃ)। যে সকল অক্ষরের সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, চার্লস উইলকিন্স সাহেব সে সকল ক্ষোদিত করেন। এই শুভ মুহূর্ত্তেই বাঙ্গালা ছাপাখানার প্রথম স্থত্রপাত।† ইহার পর ১৭৯৩ খ্রীঃ ফরষ্টর সাহেব, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুরের সংগৃহীত আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ইনিই প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। যদিও উপরোক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হাল-হেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মহানগরে ছাপা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সংস্করণের কয়েকখানি পুস্তক আমাদের হস্ত-গত হইয়াছে। পুস্তকখানির অক্ষর, কাগজ, লেখা সকলই আশ্চর্য্য। পুস্ত-কের নীচে লেখা আছে "লণ্ডন মহানগরে চাপা হইল—১৮১১।" ছাপা দেখিয়া বোধ হয়, পুস্তকখানি লিথো করিয়া ছাপা, ভারত হইতে যেরূপ কাপি প্রেরিত হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ ছাপা হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতু-হল নিবারণের জন্য এই পুস্তকের এক স্থানের ভাষা তুলিয়া দিলাম। সে সময়ের বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারিবেন।

* রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৬৯ পৃষ্ঠা এবং রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব, ২য় সংস্করণ ১৫৪ পৃষ্ঠা এবং নব্যভারত পঞ্চম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, এবং নব্যভারত একাদশ খণ্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

"আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুইজন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অত-এব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য্য করা উচিত নহে অতএব এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিয়মভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন।" ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা এইরূপ। সাধারণতঃ লোকেরা বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল।* এইরূপ অবস্থার সময় রামমোহন কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার আগমনের পর কলিকাতায় ও বঙ্গভূমিতে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। রামমোহন রায় নানা সংস্কারের সহিত প্রথমেই বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারের জন্য গভীররূপে মনোযোগী হইলেন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পুস্তকে যাহা লিখিয়া-ছেন, তাহা তুলিয়া দিলাম ;—

"তদনুসারে তিনি পুরাণ প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশ মধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্নবান হইলেন এবং তদুপায় স্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়ক্রমঃ সময়েই "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিলেন। * * * এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ১০টী প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। * * কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্ট পথে আনয়ন, এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না, লিখিত হইত। এই জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ইত্যাদি করিতে হইত। * * তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া নানা গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। * * রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় ৩য় বা ৪র্থ ব্যাকরণ। ইহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে।" ১৫৯, ১৬০ ও ১৬১ পৃষ্ঠা।

অনেক অবান্তরিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

---

* ১৭৮৭ শকের, অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের উদ্ধৃতাংশ, ৪৫ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা স্মরণ হইলেই প্রধানতঃ মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হয়। রামমোহন রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা,—ইহার উপর ইনি যে প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের নবজীবন ও সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ। জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন কোন্ জাতি কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে ? গ্রীক লাটিন ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রীস ও রোমের উন্নতি, সংস্কৃতের উন্নতিতে ভারতের অসংখ্য জাতির উন্নতি, ফরাসী ভাষার উন্নতিতে ফরাসী জাতির একদিন উন্নতি হইয়াছিল ; আর আজ ইংরাজি ভাষার উন্নতিতে ইংরাজ-জাতি পৃথিবীর মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যুৎবেগে এই ইংরাজি ভাষা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইতেছে, তৎসহ বিদ্যুৎবেগে এই অসামান্য জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। যখন ইংরাজি ভাষার অবনতি হইবে, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষার অবনতিতে যেরূপ গ্রীসীয়, রোমীয় ও ভারতীয় জাতির অধঃপতন হইয়াছে, সেইরূপ, তখন ইংরাজ জাতিরও মহাপতন হইবে। ভাষা হৃদয়ের ছায়া, ভাষা মনোবিজ্ঞানের বিবৃতি, ভাষা মানব হৃদয়ের মহাবল। ভাষা মৃতকে জাগায়, ভাষা দুর্ব্বলকে বলীয়ান করে। ভাষা-অস্ত্রবলে কি অসাধ্য যে সাধন করা যায় না, আমি তাহা জানি না। ভল্টেয়ার, রুসো, ভিক্টর হুগো ভাষা বলে মৃত ফরাসী দেশকে সজীব করিয়াছিলেন, এবং দান্তে ও ম্যাট্‌সিনি মৃত ইটালীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। যে জাতির জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি নাই, সে জাতি চির অবনত, চির পর পদানত, চির নিদ্রিত, চির মৃত। রামমোহন রায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে সামান্য দুই চারিখানি গদ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহা কিছুই নয়। গদ্য-ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, বঙ্গভূমিতে, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ভাষা, দর্শন, সঙ্গীত সমস্ত তিনি রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মূলপত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মা যখন নবজীবন লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তাঁহার অজেয়, দুর্দ্দম্য শক্তির প্রভাবে বঙ্গভূমি কাঁপিয়া উঠিল। নানারূপ আন্দোলনের সহিত ভাষার স্রোত বহিল, তর্ক বিতর্ক ছুটিল। বঙ্গভূমি সজাগ হইয়া উঠিল। সকল দিকে "হই-হই রই-রই" রব পড়িয়া গেল। এমন এক বৈদ্যুতিক স্রোত বহিল, যাহার প্রবাহে বাঙ্গালায় দিন দিন অসংখ্য লেখক আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে আকারে, গঠনে, রচনাচাতুর্য্যে সজ্জিত করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইল, সে

সকলই যেন মহাত্মা রামমোহন রায়ের অনুপ্রাণনের ফল। এক ভাষা, এক ঈশ্বর—এই দুই মহামন্ত্র ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই ; ইহা প্রচারই যেন এই মহাত্মার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইল, তাঁহারা সকলেই এই দুই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহারা সকলেই এই দুই মন্ত্রে দীক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত। দেশ-সংস্কার ইহার আনুষঙ্গিক ফল। এই দুই সংস্কারের সহিত তদানীন্তন কালের বঙ্গসমাজ দেখিতে দেখিতে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহারা ধীর চিত্তে ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই জানেন। মহাত্মা রামতনু, কৃষ্ণমোহন, হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, রসিক কৃষ্ণ, এবং ইহার পরবর্ত্তী যুগের মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, প্যারীচরণ, প্রতাপচন্দ্র, কালীচরণ, কৃষ্ণদাস, সুরেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, নরেন্দ্র নাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন, হেমচন্দ্র, লালমোহন, শিবনাথ,যোগেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া কেহ বা সমাজ, কেহ বা রাজনীতি, কেহ বা ভাষা সংস্কারে মনোযোগী হইলেন। ইঁহারা সকলেই যেন প্রকারান্তরে রামমোহন রায়ের রক্তে জীবন প্রাপ্ত। রাজার সম-সময়েই বঙ্গভূমিতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজার প্রতি অত্যাচারের স্রোত একটু থামিল, চতুর্দ্দিকে জয় জয় কারে রাজার নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। সতীদাহ নিবারণ হইল, আর সকলের দৃষ্টি দেশসংস্কারের দিকে প্রধাবিত হইল। যাহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা শেষে শিষ্য হইল, সংস্কারের বীজমন্ত্র গ্রহণ করিল। এই-রূপে মহাত্মা রামমোহন ত্রয়োদশ শতাব্দীর গতি নির্দ্ধারণ করিয়া, ১৮৩৩খ্রী-ষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে স্বর্গারোহণ করিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ রাজার জীবনচরিতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ। ইতিহাসের সমস্ত কথার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর নেতা। তাঁহার তিরোধানের পর কিরূপে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইল, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাঙ্গালা পদ্য ও সংগীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কৃত্তিবাস রামায়ণ এবং কাশীরাম দাস মহাভারত বিবৃত করিয়া এবং মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, রামেশ্বর,

চণ্ডী, মনসার ভাসান, শিবসংকীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্য সকল প্রণয়ন করিয়া পদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রামমোহন রায় পূর্ব্ব সংস্কার ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া, ভাষাকে পদ্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কদর্য্য রুচির স্থলে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিলেন। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের ন্যায় দেশের আপামর সাধারণের কণ্ঠস্থ।

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সম ভাবে।
এই আশা তরুতলে, বসিয়াছ কুতুহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।"

এইরূপ দেহাত্মিক, পারমার্থিক সঙ্গীত বাঙ্গালা ভূমির আমূল পরিশোধিত করিয়া বঙ্গদেশকে ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্ম সংস্কার, দেশোন্নতির প্রধান কারণ। ভাষা-সংস্কার ও ধর্ম্ম-সংস্কার, মহাত্মা এই দুই সংস্কারে মনোযোগী হইয়া বঙ্গের, তৎসহ ভারতের, এবং তৎসহ জগতের ভাবী উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তাঁহার গদ্য রচনা, রাজীবলোচনের রচনা হইতে কত পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাঁহার গ্রন্থের এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতেছি,—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে। এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্ত চন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।" ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষাই বলা যায় না। কিন্তু প্রথম অবস্থা স্মরণ করুন। মহাত্মাই লেখক, মহাত্মাই গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচয়িতা। প্রথমকার অবস্থায় ইহাপেক্ষা আর কি হইবে, কি হইতে পারে? যদিও ২।৩ জন সাহেবের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার মূল গঠিত, তথাপি বলিতেই হইবে, মহাত্মা রামমোহন এ ক্ষেত্রে কার্য্য না করিলে বাঙ্গালা ভাষা জাগ্রত হইত না। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদিগের

ভাষা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল, এখনও কতক সেইরূপই আছে; তাহাকে বাঙ্গালা বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়; আর রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ ভাষার পরিচর্য্যায় প্রাণ মন ঢালিয়া ভাষাকে দিন দিন নব নব সাজে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যে কি উপকার হইয়াছে, এক কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা কোন কালেও, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ, প্রেমাবতার বিদ্যাসাগর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয়কুমারের নাম তত্ত্ববোধিনীর সহিত এদেশে অক্ষয় হইবে।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যুবাপুরুষ ছিলেন। এই মহাত্মা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে—১২২১ সালে নদিয়া জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে, তারপর চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পুনর্ব্বার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। পঠদ্দশাতেই মদনমোহন রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা নামক দুই খানি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি দর্শনে পূজ্যপাদ ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন। পাঠান্তে, কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তিন বৎসর মাত্র সেখানে ছিলেন। কলিকাতার "সংস্কৃত যন্ত্র" তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হয়, এবং এ যন্ত্রে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়ে মহাত্মা বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই মহাত্মা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য উত্তেজিত করেন এবং দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, সমাজচ্যুতির ভয় গঙ্গায় ভাসাইয়া, আপন কন্যাকে স্কুলে,অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। শিশুবোধক বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না বলিয়া, তিনি শিশুশিক্ষা তিন ভাগ এই সময়ে রচনা করেন। এই সময়েই সর্ব্বশুভকরী নামক মাসিক পত্রিকা তাঁহার যত্নে প্রচারিত হয়। ইহাতে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এমন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,যাহা দেখিয়া

সকলেই মোহিত হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ তিনি মুর্সিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ৬ বৎসর ঐ কাজ করার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার পর কান্দিতে পরিবর্ত্তিত হন, এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলাউঠা রোগে সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। ইনি রামমোহন রায়ের সমকালিক লোক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে—১২১৫ সালে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই। কিন্তু তখন হইতেই কবিতা লিখিতেন। ইনিও রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যহিক, তৎপরে প্রাত্যহিক হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুই-ই থাকিত। ইহা ভিন্ন "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ডপীড়ন" নামে আর দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষোক্ত পত্রের সহিত ৺ গৌরীশঙ্কর (গুড় গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার তুমুল বিবাদ হয়। ইহার পর মাসিক প্রভাকর প্রচার করেন। শেষাবস্থায় তিনি প্রবোধ-প্রভাকর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও কলি-নাটক রচনা করেন। ইনি এক হিসাবে মহাত্মা বঙ্কিম চন্দ্রের বাঙ্গালা ভাষা লেখার গুরু। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে,—১২১০ সালে, দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন। কাটোয়ার সন্নিহিত বাদমুড়া গ্রামে ইহার পৈতৃক বাস। ইনি পাঁচালী দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন, প্রভৃতি পালা-গ্রন্থ আছে। তদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পালাও আছে।

তৎপর প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। রামমোহন রায়ের বৃদ্ধাবস্থায়, অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে—১২২৬ সালে—১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, হুগলী জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার অধীন হইয়াছে। ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ স্বর্গারোহণ করেন। ইহার জীবন আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ইনি কি করিয়াছেন, সকলেই জ্ঞাত আছেন, তাহাতে তিনি অমর। বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ৪০ টীর অধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনেও এক

জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির বন্ধু—বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের যে সংস্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনন্তকাল অবলাকুলের এবং সর্ব্বসাধারণের পূজা পাইবেন। তিনিই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ আইন বিধবাদের জন্য বিধিবদ্ধ করাইয়া গিয়াছেন। নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবার পাণিগ্রহণ, প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিয়া, তিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ এদেশে প্রায় দেখা যায় না। বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বহুবিবাহ-বিচার পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিদ্যাসাগরের ৩০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বালকশিক্ষা হইতে প্রাচীনশিক্ষার সমস্ত পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষাকে নিয়মাধীন করিয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, এবং সংস্কৃত শিক্ষার সহজ উপায় প্রদর্শনের জন্য উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রকাশ করেন। এখন যে সুন্দর বাঙ্গালা দেখা যায়, বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে তাহা ছিল না। বিদ্যাসাগরের সমস্ত কথা লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া যায়। সুতরাং এস্থলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

১৭৪২ শকের আশ্বিন মাসে বিদ্যাসাগরের জন্ম, এই শকের শ্রাবণ মাসে মহাত্মা অক্ষয়কুমারের জন্ম। উভয়ে সমসাময়িক, উভয়েই রামমোহনরায়ের সমকালিক লোক। বর্দ্ধমানের অধীন চুপী নামক গ্রামে, কায়স্থ বংশের দত্তকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সামান্য বাঙ্গালা ও পারশী শিক্ষা করিয়াছিলেন। বয়স বাড়িলে ইংরাজী ও ফরাশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিকসেকসন, ফ্যালকুলম প্রভৃতি গণিত, জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান সুন্দররূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রমাস হইতে শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত, ১২ বৎসর কাল ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার তিনি জীবনস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার সময়ে কত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ যে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। চারুপাঠ ও ধর্ম্মনীতির সুন্দর প্রস্তাব সকল প্রথমে প্রবন্ধাকারে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। শেষ জীবনে দারুণ মস্তিষ্ক পীড়ায়

আক্রান্ত হইয়া বালীগ্রামে ছিলেন, সেখানে ১৮০৮ শকের, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ৬৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি তিন ভাগ চারুপাঠ, দুইভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও দুইভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় রচনা করেন। তাঁহার রচনা সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ ও রুচি মার্জ্জিত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে,—২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন দেহত্যাগ করেন, তাহার ৯ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে—১৭৫০ শকে,—১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরই বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হন এবং প্রথমেই হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বঙ্গদেশের গৌরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধানতম মহাপুরুষগণ এই কলেজেই বিদ্যাশিক্ষা করেন। ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ৺ রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, ৺ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ রামগোপাল ঘোষ, ৺ রমাপ্রসাদ রায়, ৺ কেশবচন্দ্র সেন, ৺ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি সকলেই এই কলেজের ছাত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু রাজনারায়ণ বসু, ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মহাত্মাগণও এই কলেজের ছাত্র। সুতরাং, মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের কাজ বাদে, তদানীন্তন কালের সকল সংস্কারের মূল, এই কলেজ। ডিরোজিয়োর নাম এ দেশে সুবিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় সৎ শিক্ষক এদেশে আর অভ্যুদিত হন নাই। অধ্যাপনা সময়ে, সভাগৃহে এবং কথোপকথন কালে তিনি ছাত্রদিগের প্রবৃত্তি সমূহের সম্যক্ বিকাশের চেষ্টা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। ছাত্রগণ যাহাতে সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি,এ, মহাশয় প্রণীত মাইকেলের জীবনচরিত হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা ও তাহার নিটকবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্ম্মসভা, না হয় ব্রাহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ লইয়া তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল। ভিতরে ভিতরে তাঁহারি ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক করিবার ক্ষেত্র স্বরূপ ছিল * * * ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরো ভীষণাকার ধারণ করিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। * * খ্যাতনামা আলেকজাণ্ডার ডফ্ এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন যথাক্রমে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পাশ্চাত্য, এবং মহামতি রামকমল সেন প্রাচ্য ভাষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা মেকলে পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের মধ্যে যোগ দিলেন এবং উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে ৭ই মার্চ্চ অবধারণ করিলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান প্রচারই গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় হইবে। মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের এই অবধারণ ভারত সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।" সুতরাং ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতি এবং জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার মূল, গৌণভাবে, মহাত্মা রামমোহন রায়। তিনি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল এই শিক্ষা। মধুসূদন কিন্তু ডিরোজিয়োর ছাত্র নহেন। মধুসূদন রিচার্ডসনের ছাত্র। মাইকেল ১৬। ১৭ বৎসর বয়সেই পৈতৃকভবন ত্যাগ করিয়া কিছুকাল মান্দ্রাজে অবস্থান করেন। এইকালে কোন ইয়োরোপীয় মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। তৎপরে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখান হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে আগমন করিয়া ৫ বৎসর কাল ব্যারিষ্টারি করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা সম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা ?, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রেঁা, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী কবিতা, হেকটরবধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মাইকেল বাঙ্গালার অমর কবি। ত্রয়োদশ শতাব্দী ইঁহার আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন মহাকবির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। ইনি বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি। বিদ্যাসাগর যেরূপ গদ্য-সংস্কারক, মাইকেল তেমনই পদ্য-সংস্কারক। ইনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতর মহৎ ব্যক্তি ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইঁহার অকৃত্রিম বন্ধু।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৭৪৭ শকের ২রা ফাল্গুন, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৮ম বর্ষ বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ সমাপ্ত করেন। তৎপর ২ বৎসর অন্যান্য স্কুলে ইংরাজি শিখিয়া ৬ বৎসর হিন্দু কলেজে পড়েন। শিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া বিদ্যাপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন এবং শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য্য করেন। তেমন অর্থবল না থাকায়, কয়েক বৎসর পর ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ২য় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দশ মাস পরেই গবর্ণমেণ্ট ১৫০৲ বেতনের হাবড়া স্কুলের হেড্ মাষ্টারী পদ তাঁহাকে দেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সর্ব্ব প্রথম তিনি শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তক প্রচার করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে লিখিত হয়। তৎপরে হুগলিতে বাঙ্গালা নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, ৩০০৲ বেতনে (১৮৫৬ খ্রীঃ) ৬ই জুন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৪০০৲ টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টর হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে নর্থ সেণ্ট্রাল নামক নূতন ডিবিজনের ইন্‌স্পেক্টর হইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর হইতে তিনি এডুকেশন গেজেটের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিলের সভ্য হন, এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে "পুষ্পাঞ্জলি" প্রচার করেন; কিছুদিন হইল, পারিবারিক-প্রবন্ধ, তৎপরে আচার-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেববাবু সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সম্প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া আপন মহত্ত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল, গবেষণাপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন তিনি পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ড ও রোমের ইতিহাস ও দুই ভাগ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইউক্লিডের কিয়দংশ রচনা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে আর দুই মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুজ্জ্বল ভূষণে সজ্জিত করিয়াছেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্র অনুবাদমূলক বাঙ্গালাকে মৌলিক আকারে পরিশোভিত করিয়া গিয়াছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা ভাষার প্রথম

উপন্যাস-লেখক। তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা পাঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান কোথায়, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। * * * প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় হইত। গদ্য রচনা ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। * * তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন। কদাচ চিনি বলিতেন না, শর্করা বলিতেন। * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ানক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্ব মত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটী গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

"এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষার চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণয়ন করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্ব-জন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে। এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নহে। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে;—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা

দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।" প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই—১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য রামারঞ্জিকা লেখেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অভেদী নামক উপন্যাস লেখেন। ইহার পূর্ব্বে আলালের ঘরের দুলাল লেখেন। অভেদীর পর "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" লেখেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে "আধ্যাত্মিকা" প্রকাশিত হয়। ইনি ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, এবং ভাষা-সংস্কারে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত পুস্তক বাদে "মদ খাওয়া বড় দায়," "যৎকিঞ্চিৎ" "বামাতোষিণী," "কৃষিপাঠ" ও "গীতাঙ্কুর" লিখিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই সকল গ্রন্থ ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪৮ শকে কালনার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূর-সুন্দরী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭৪৫ শকে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। নাটকে ইনি বেশ কৃতী ছিলেন। ইঁহাকেই প্রথম বাঙ্গালা নাটকলেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "ভদ্রার্জ্জুন" বাঙ্গালার প্রথম নাটক ও হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতীর চিত্তবিলাস" দ্বিতীয় নাটক, কিন্তু এ সকল পুস্তক ভাল নহে বলিয়া ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় কাদম্বরী ও রাসেলাস নামক পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদক।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রগণের জন্য "পুরুষ পরীক্ষা" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৭৪২ শকে, চাঙ্গড়িপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নীতিসার তিন ভাগ, রোমের ইতিহাস ও গ্রীস দেশের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সোমপ্রকাশ সম্পাদক হইয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মহলে যুগান্তর উপস্থিত করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

সংবাদ ও সাময়িক পত্র।—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল-গেজেট" প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনরী-গণ কর্ত্তৃক "সমাচার-দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক পত্র ও "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিত হইয়া "কৌমুদী" এবং মিশনরীগণ "গস্পেল ম্যাগাজিন" প্রকাশ করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে ইঁহাদের মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সমাচার-চন্দ্রিকা" প্রকাশ করেন, ইহা এখন দৈনিকের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন" প্রকাশ করেন, ইহা বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন হালদার "বঙ্গদূত" প্রকাশ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়" বাহির করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম সেন "বিজ্ঞানসেধবী" বাহির করেন। এই অব্দে অক্ষয় কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "ভাস্কর" প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" প্রকাশ করেন। এই অব্দে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গেজেট বাহির করেন, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র মিলিত হইয়া "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা, ইংরাজি, দুই-ই থাকিত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জমীদার কালীনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর ভার অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর দক্ষতার সহিত সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "রসসাগর" প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "সর্ব্বশুভকরী" প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাতে লিখিতেন। ১৮৫১ খ্রীঃ কলিকাতার "বর্ণাকিউলার-সোসাইটী" সমাজ স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় বিবিধার্থ-সংগ্রহ কিছু দিন বেশ চলিয়াছিল। ইহার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে ইহার নাম "রহস্য-সন্দর্ভ" হয় এবং প্রাণনাথ দত্ত ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ ৮ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০ সাল হইতে

প্রকাশিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত ইহার সুযোগ্য সম্পাদক। ইহার পরই বঙ্গদর্শনের যুগ। ১২৭৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে মহাত্মা কেশব-চন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া সুলভ-সমাচার প্রকাশ করেন ও বর্ত্তমান যুগের সুলভ সংবাদপত্র প্রচারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ইহার পরের ইতি-হাস সকলেই জানেন। ক্রমে ক্রমে কিরূপে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে বঙ্গ প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং সে সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

বঙ্কিম বাবু, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, প্যারীচাঁদ মিত্রই সরল বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার যুগ-পরিবর্ত্তন নির্ণয় করিতেছি। ইহার পর হইতে যে সকল লেখকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, ৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নবীনচন্দ্র সেন, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺ রাজকৃষ্ণ রায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গপ্রদেশে অসংখ্য কৃতী লেখক অভ্যুত্থিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের বিষয়ই পাঠকগণ অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞাত আছেন, সুতরাং সে সকল সম্বন্ধে এখন কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, ১৭৬০ শকে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সংস্কারক। অন্য-তর সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম বাবু, কেশব বাবুর কয়েক মাসের বড়। কেশব বাবু, ১৮৮৪ খ্রীঃ, জানুয়ারি মাসে বহুমূত্র রোগে স্বর্গারোহণ করেন। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রও, বহুমূত্র রোগে, বিগত ১৩০০, ২৬শে চৈত্র, রবিবার ৩-২৫ মিনিটের সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন, মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, শেষভাগে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশব চন্দ্র। এক কথায় বলিতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রামমোহন-রায়-

যুগ। দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিণত করিবার জন্যই যেন এই শতাব্দীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। শত বৎসর কোন দেশের জাতীয় ভাষার গঠন এবং সংস্কারের পক্ষে কিছুই নয়; কিন্তু দেখিতেছি, এই এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে যে, ইহাকে এখন একটা ভাষা বলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী লোকেরাও কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশ কি কম সৌভাগ্যশালী যে, এক শত বৎসরের মধ্যে শত শত প্রতিভাশালী লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আরো কত কি উন্নতি হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত যখন আমাদের দ্বারা নব্যভারতরূপে অভিহিত হইয়াছিল, তখন কত লোক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, সেই ভারতকে যখন কটন সাহেব নব্যভারত বলিলেন, তখন সকলে নির্ব্বাক্। একশত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে আপনাদের সিংহাসন বদ্ধমূল করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ভারতের অসংখ্য জাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার আস্বাদন দিয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন জাতীয় মহাসমিতি-গঠন-যুগ আনয়নের কারণ হইয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রজানীতি সম্বন্ধে প্রধান ঘটনা। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তক; সুতরাং ইহার মূলেও রামমোহন। সিপাহি-বিদ্রোহের কলঙ্ক ভারতবাসীর অঙ্গ হইতে প্রক্ষালিত হইয়াছে, এখন ভারতবাসী শিক্ষিত, সুসভ্য, দেশ-হিতৈষী, পরদুঃখ-কাতর—স্বদেশপ্রেমিক, ইংরাজের অনুগত। এই একশত বৎসরের মধ্যে কত মহৎ লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সংখ্যা নাই। সে সকল ইতিহাসলেখক স্বর্ণাক্ষরে লিখুন। আমরা বলিতে চাই, দেশের উন্নতির মূল, ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন। ত্রয়োদশ শতাব্দী এই দুই বিষয়ে বঙ্গদেশে যে স্বর্গীয় ছবি আঁকিয়াছে, কালে এই ছবি যে ভারতে সমুজ্জ্বল হইবে এবং তাহা দেখিয়া যে জগৎ আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাহসপূর্ব্বক লিখিতে পারি, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত কার্য্য অতি সুন্দর-রূপে সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা সকল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল, ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত যে কোন দেশের যে কোন সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহা উষায় এক মহাত্মা ভারতের এক কোণে দাঁড়াইয়া যে ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন, সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাহারই আন্দোলন চলিয়াছে। বাঙ্গালার

ত্রয়োদশ শতাব্দী, ইংলণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধান ও প্রথম কার্য্য একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি। আর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অবান্তরিক। জাতীয় উন্নতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বড় অধিক নয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। এরূপ শতাব্দী আর কখনও বঙ্গদেশের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, জানি না। আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহাও জানি না। বঙ্গ প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহাত্মা জীবিত আছেন এবং গত শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে কোন দেশ এই সকল মহাত্মার দ্বারা অমর হইতে পারে। ভারত অতি সৌভাগ্যশালী, এই শতাব্দীতেই রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উদয় ও তিরোধান। ভারত সৌভাগ্যশালী, এই শতাব্দীতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র উৎকৃষ্ট বিচারক এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র অসামান্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ। বঙ্গ সৌভাগ্যশালী যে, এই শতাব্দীতেই দয়ার সাগর মহাত্মা বিদ্যাসাগর, মহামতি তারক চন্দ্র প্রামাণিক এবং দীনজননী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দী ভারতের চিরস্মরণীয়; এই শতাব্দীতেই সাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন নিবারিত হইয়াছে, সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোম্পানীর রাজ্য মহারাণীর হাতে গিয়াছে এবং তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে ভারত শাসন করিবেন, এই উদার কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই শতাব্দীতেই স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, ভারত রেল এবং তাড়িতারে বেষ্টিত হইয়াছে। এই শতাব্দীতেই জাতীয় মহাসমিতির অভ্যুদয়। আমরা কখনও এ শতাব্দীর কথা ভুলিব না। ভুলিব না, মহাত্মাদিগের আবির্ভাবের কথা—আর ভুলিব না মহাত্মাদের তিরোধানের কথা। রামমোহন গিয়াছেন, কেশব গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ গিয়াছেন, দয়ানন্দ ও ত্রৈলঙ্গস্বামী গিয়াছেন, কৃষ্ণদাস গিয়াছেন, মাইকেল গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন; আর সে দিন আমাদের বাঙ্গালা দেশের অদ্বিতীয় প্রতিভার খনি, সাহিত্য-জগতের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র গিয়াছেন। ২৬শে চৈত্র, রবিবার, ১৩০০, নিমতলার শ্মশানে যে অমূল্য দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি, তাহা আর জীবনে ভুলিব না। ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়, চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় বারি বর্ষিত হয়—এই শতাব্দীর কিইবা সজ্ঞানে ভুলিতে পারি? দলিপের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার ভুলিতে পারি না,

১২৮৩ সালের বঙ্গের জলপ্লাবন ভুলিতে পারি না, বোম্বে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ভুলিতে পারি না, দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞ ভুলিতে পারি না, গুই কুমারের সিংহাসন-চ্যুতি ভুলিতে পারি না, মণিপুরের হত্যাকাণ্ড ভুলিতে পারি না, ভীষণ সিপাহি যুদ্ধও ভুলিতে পারি না। ত্রয়োদশ শতাব্দী ভারতের বুকের রক্ত দিয়া রচিত। ইহার কিছুই ভুলিবার নয়। তবে যাও বড় সাধের ত্রয়োদশ শতাব্দি, তুমি কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হও; কিন্তু, তুমি বলিয়া যাও, ভারতের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে। যে সকল অমূল্যরত্ন তোমার গর্ত্তে ডুবিয়াছে, আর কি তাহা পাইব? তাঁহারা যে সকল রক্তবিন্দু পাত করিয়া গিয়াছেন, বলে যাও, তাহা হইতে পরশ্রীকাতর, পর-পদ-দলিত, স্বার্থপর ভারতবর্ষীয় জাতির মধ্যে, রক্তবীজের গোষ্ঠীর ন্যায়, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী দলের উদ্ভব হইবে কি না? বলে যাও, তোমার কোলের ধন একেশ্বরবাদ এবং বাঙ্গালা ভাষা স্থায়ী হইবে—উন্নতিলাভ করিবে, না তোমার সহিত—রামমোহন ও কেশবের সহিত—বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের সহিত ডুবিবে? তুমি সবে মাত্র কাল গিয়াছ—আজ তুমি কত দূর? ক্ষণকাল দাঁড়াও, দু'টা কথা বল। অমূল্য বঙ্কিম-রত্ন লইয়া তুমি উল্লাসে ছুটিলে, আর একটী কথাও বলিবে না? হা কাল, হা মহাকাল, তোমার বিচিত্র লীলা! বুঝিয়াছি, তুমি দাঁড়াইবে না, তুমি কথা শুনিবে না, উত্তর দিবে না—এ দেশ জাগিবে কি ডুবিবে। আমরা সময়ের দাস, তোমার কথা ভাবি আর আনন্দিত হই, ভাবি আর অশ্রুতে সিক্ত হই। এ দেশের ভাগ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইবে কি?—স্বাধীনতার রাজ্য বহুদূর; বিশুদ্ধ চরিত্রের রাজ্য বহুদূর; ধর্ম্ম ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন কে করিবে যে, চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার হইবে? বুঝি বা আমরা মরণের কোলেই পড়িয়া রহিলাম। হা কাল, হা মহাকাল!!

১লা বৈশাখ, ১৩০১ সাল।

নব্যভারতের যুগান্তর।

পতন ও উত্থান, প্রকৃতির নিয়ম। মানবশিশু বহুবার ভূপতিত হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। বহুবার পাপ-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, মানব-পিতা দ্বিজত্বের পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে নিয়ম ব্যক্তি সম্বন্ধে, তাহা জাতি

সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বিনাশকারী, অত্যুন্নত ষষ্ঠি সহস্র বৌদ্ধ প্রচারকের শ্মশান-ভূমিতেই শঙ্কর এবং কুমারিল ভট্টের নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়-পতাকাধারী নব ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। মানবরাজা খ্রীষ্টের রক্তপাতেই প্রাচীন ইহুদি জাতি ও ধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল। চিরকালই পৃথিবীতে প্রাচীনত্বের পতন-দুর্গ ভেদ করিয়া নব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। যাহা সত্য ধর্ম্মরাজ্যে, তাহা সত্য রাজনীতিক্ষেত্রে। ইতিহাস স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে, ধর্ম্মের উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি, ধর্ম্মের পতনেই রাজ্যের পতন। বুদ্ধের অনাবিল স্বর্গীয় ধর্ম্মবলেই অশোক রাজ্যের শাসন সমূহ জয়যুক্ত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্ম্মবলের পতনেই বৌদ্ধরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের তেজ ও গৌরবের দিনেই যুধিষ্ঠির, জনক, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজার প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল, সেই ধর্ম্মের মলিনতার সহিত হিন্দুরাজ্য যবন-রাহুর করে কবলিত। মুসলমান ধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্যের দিনেই মুসলমান রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, বিধর্ম্মী আকবরও শ্রীরাম চন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জক বলিয়া এদেশে পূজিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ জাতির অন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম আজকাল চরম উন্নতিতে আরূঢ় বলিয়াই ধরায় ইহার এত বিস্তৃতি ও এত সম্মান। এই ধর্ম্ম যতদিন এই জাতির চরিত্রভিত্তির মূলে সুদৃঢ় থাকিবে, ততদিনই ইংরাজ-রাজ্য পৃথিবীতে অটল ও অচল। দৃষ্টান্তের বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম পতনে রোমের পতন হইয়াছিল, আবার ম্যাট্‌সিনির পুণ্যপ্রভাবে ও ধর্ম্ম-গৌরবে রোম স্বাধীনতার স্বর্গীয় প্রভায় আজ প্রদীপ্ত। চীনের পতনে বর্ত্তমান সময়ে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পতনেরই আভাস পাইতেছি; এবং জাপানের বিজয় উন্নতিতে পুণ্য প্রভারই পরিচয়। জাতির উন্নতি অবনতিতে ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির পূর্ণতার প্রকাশ। নব্যভারত এই সাধারণ নিয়মের অতীত কি?

কে বড়, কে ছোট? আমাদিগকে কেহ যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এক কথায় বলি, যে ব্যক্তি আপন বিশেষত্ব-পূর্ণ ধর্ম্ম ও চরিত্রে অটল, যে ব্যক্তি পাপ সংগ্রামে জয়ী, তিনিই বড়; আর যে ব্যক্তি পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় চালনায় ব্যতিব্যস্ত, বিলাসের দাস, কাম ক্রোধের অধীন, রাজৈশ্বর্য্যে ও পাণ্ডিত্যে ভূষিত হইলেও তিনি তৃণাপেক্ষা নীচ। ধর্ম্মে ও চরিত্রে এ জগতে শ্রেষ্ঠ, রাজার রাজা বুদ্ধ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য ও কন্‌ফিউসস্। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ, আমাদের মতে, মাট্‌সিনি, পার্কার, ব্রাইট ও গ্লাডষ্টোন; আমাদের

দেশে রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ। যুগ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও চিরদিন জগতে সমভাবে আদৃত হন নাই, সমভাবে পূজা পান নাই। পতন ও উত্থান ইহাদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। যদি এই পতন উত্থানের ক্রম-বিকাশ আমরা, জাতি পরম্পরা, দেশ পরম্পরায় নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া থাকি, তবে ইতিহাস পাঠ বৃথা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে কখনও ধর্ম্ম ম্লান হয়, কখনও উজ্জ্বল হয়; জাতির জীবনেও কখন ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। যে ব্যক্তি যখন ধর্ম্মে ও চরিত্রে উজ্জ্বল, সেই ব্যক্তিই তখন শ্রেষ্ঠ; যে জাতি যখন ধর্ম্মে উজ্জ্বল,সেই জাতিই তখন শ্রেষ্ঠ। সম্বৎসর ও যুগ পরম্পরায় ব্যক্তিগত ধর্ম্মের পতন ও উত্থান হইতেছে, জাতিগত ধর্ম্মেরও পতন উত্থান হইতেছে। আর্য্যের গৌরব, ধর্ম্ম গৌরবের পরিণতি,—ধর্ম্মের পতনের সহিত তাহা বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। জোর করিয়া, ঢাক বাজাইয়া যদি ঘোষণা করি, আজও আর্য্যই শ্রেষ্ঠ, সে কথায় পৃথিবীর কোন মহীয়ান্ ব্যক্তিই সায় দিবে না। যাহা নাই, যাহা ডুবিয়াছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কে শুনিবে? কালসহকারে অত্যুন্নত আর্য্যভূমি প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে;—আর্য্যজাতি পুণ্যপ্রভাব-বর্জ্জিত যখন, তখন আর ইহাকে বড় বলিলে, পৃথিবীর লোক শুনিবে কেন? তোমার মূর্খতাই তাহাতে প্রকাশ পাইবে। যাহা ডুবিয়াছে, তাহা কি আবার উঠিবে না? উঠিবে, উঠাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কি ভাবে, কি প্রভাবে উঠিবে, বিধাতাই জানেন।

যে ঘটনায় ইংরাজ জাতি এ দেশে জয়ী, সে ঘটনাকে প্রবঞ্চকের ক্ষণক্রীড়া বলিয়া উপেক্ষা করি, কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার করি, ভারতে ইংরাজ-আগমন, ভারতের নবজীবনের কারণ। বহুদিন, বহুযুগ, বহু শতাব্দী গত হয় নাই, ইংরাজ এদেশে আগমন করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই বিপর্য্যয়, ধ্বংস, আন্দোলন যথেষ্ট হইয়াছে। যে জাতি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, সে জাতিরও একটু একটু সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে। সহস্র কণ্ঠে বলিব, ইংরাজ-শাসন প্রদীপ্ত না হইলে, মুসলমান-শাসনের কঠোরতায় এদেশ চিরকালের জন্য ডুবিত। ব্যক্তিগত উন্নতি অবনতির কথা এস্থলে বলিতেছি না,—কোন লোক বড় পদ পাইয়া সে সময়ে সম্মানিত হইলেও হইতে পারিতেন; কিন্তু সমগ্র ভারতীয় জাতির ধ্বংস, দেশ-ধ্বংসের আর কিছু বাকী থাকিত না। বাকী ছিলই বা কি? মাতৃজাতি, আর্য্যজাতির চিরপূজ্যা; মুসলমান শাসনে সেই মাতৃজাতি বিলাসের সহচরী বলিয়া প্রতিপন্না হইয়া-

ছিলেন। আজও এদেশের লোক, রমণীজাতিকে তেমন সম্মান ও পবিত্রতার চক্ষে দেখিতে পারে না! তাঁহাদিগকে অবরোধ-নিগড়ে, বৈষম্য-কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াও সন্দেহের হস্ত হইতে পুরুষজাতি রক্ষা পায় নাই—তার উপরও পদাঘাত, নির্যাতন, কুটীল দৃষ্টি। এই মাতৃজাতির নির্যাতন, আর্য্য-ভূমিতে, সীতা সাবিত্রীর সময়ে, খনা লীলাবতীর সময়ে, মহীয়ান্ পুণ্যযুগে ছিল না। যে দেশের শাস্ত্র কীর্ত্তন করে, নারীজাতির পূজা ভিন্ন দেবতারা প্রসন্ন হন না, সে দেশে নারীকে এমন হীনাবস্থায় কে আনয়ন করিল? যে দেশে নারী ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, রাজ্যশাসন হয় না, সেই দেশে নারীকে ঘৃণার সামগ্রী কে করিল? বলিবই, মুসলমান শাসন, এদেশের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের যে দেশে মুসলমানগণের যে পরিমাণে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে, সেই দেশে সেই পরিমাণে নারীর দুর্দ্দশা হইয়াছে! স্ত্রী-শিক্ষা ডুবিয়াছিল, স্ত্রী-স্বাধীনতা ডুবিয়াছিল, স্ত্রী-অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, পূজ্যা মাতৃজাতির ছিল কি? এখনই বা আছে কি? বিধি ব্যবস্থা সকলই রমণীর এক প্রকার, পুরুষের অন্য প্রকার;—রমণী একবার পতিতা হইলেই চির-পতিতা, পুরুষ শত বার পতিত হইয়াও সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তা! রমণী অতি বাল্যকালে পতি হারাইলেও ব্রহ্মচর্য্যা করিবে, পুরুষ আমরণ পত্নী-বিয়োগে কেবল পত্নীগ্রহণই করিতে থাকিবেন!! এ সকল বিসম্বাদী চিত্র, সহধর্ম্মিণী বলিয়া যে দেশে নারী কীর্ত্তিতা ছিলেন, সে দেশে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল? মুসলমাননীতি, শ্লথ আর্য্যনীতিকে পরাজয় করিয়া, এ স্থলে যোগ্যতমের অধিষ্ঠানের (Survival of the fittest) চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। মুসলমান শাসনে আর্য্যজাতির আর্য্যত্ব ডুবিয়াছে—ধর্ম্ম ডুবিয়াছে,—পুণ্য পবিত্রতা ডুবিয়াছে,—সাধন ভজন বিশ্বাস ভক্তি সবই ডুবিয়াছে। মরণের চির অন্ধকারময় তীরে আর্য্যত্বের সমাধি হইতেছিল যখন, এমন সময়ে ইংরাজ এদেশের ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। পলাসি সমরের অস্তমিত সূর্য্য আবার নবতেজে উদিত হইলেন। প্রখর জ্যোতিতে, মরণের তীরে শায়িত নরনারী আবার নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। পাখী সুপ্রভাতে সুস্বরে আবার ডাকিল, ফুল ফুটিয়া সৌরভ ছড়াইল, আর্য্যভূমিতে সুবায়ু বহিল। মরা মানুষের শরীরে একটু একটু জীবন সঞ্চার হইল।

মরা মানুষের জীবন সঞ্চার হইলে যাহা হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে এদেশে তাহাই হইল। অনুকরণের একটা প্রকাণ্ড হই-চই পড়িয়া গেল,

দলে দলে লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল, ধুতি চাদর ছাড়িয়া হ্যাটকোট ধরিল; আহার বিহারের কথা আর কি বলিব, মদ্য মাংস প্রচুর পরিমাণে সমাজে চলিতে লাগিল। ইংরাজের রমণীপূজা বা মাতৃপূজা, ধর্ম্মভাব বা চরিত্রবল, ধৈর্য্য বা অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতা বা তিতিক্ষা, স্বাধীনতা বা শ্রমশীলতা—এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না; কেবল কু-অনুকরণের দিকে এ জাতির অবিরাম গতি চলিল। ইংরাজি শিক্ষা এদেশের প্রাচীন কুসংস্কার-ধ্বংস করিয়া আপন বিজয় নিশান আকাশে তুলিল। মহামতি রামমোহন রায় এই কু-অনুকরণপ্রিয়তার প্রতিরোধের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। দলে দলে লোক জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া খ্রীষ্টান হইতেছিল, তিনিই এ গতি ফিরাইলেন। লিখিত গদ্যময় জাতীয় ভাষা ছিল না,—বাঙ্গালা গদ্য লেখার প্রথা ছিল না, তিনিই প্রথম গদ্য লিখিয়া জাতীয় ভাষার সূত্রপাত করিলেন। সতীদাহ নিবারণ করিয়া মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি যে বর্ত্তমান আন্দোলনের সর্ব্ব প্রধান অধিনায়ক, এ কথা ঘোর শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহারই চেষ্টার ফল। সমাজ-সংস্কার তাঁহারই প্রখর বুদ্ধির প্রবর্ত্তিত কার্য্য। তাঁহার পর আসিলেন, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, এবং বিদ্যাসাগর। ধ্বংস কার্য্যের স্থানে প্রতিষ্ঠার কার্য্য করিতে এবং রমণী সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিতে এই মহাত্মারাও সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। অসঙ্কোচে বলিতেই হইবে, ইঁহাদের চেষ্টাতেই ভারতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা হইল। অনুকূল অবস্থায়, যথা সময়ে, মহামতি রিপণ, এই যুগের প্রধান পুরোহিত রূপে ভারতে আসিলেন। এই সময়ে আমরা, বহুজনের ঠাট্টা বিদ্রূপ মস্তকে করিয়া, ভারতকে নব্যভারত নামে অভিহিত করিলাম। সুখের বিষয়, অধিক দিন আমাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইল না; রিপণ-আগমনের অল্পকাল পরেই কটন সাহেব (New India) নামক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। নবযুগের নব্যভারত নাম অক্ষয় হইল। ১২৯০ সালের সেই প্রথম দিন, আর আজ এই ১৩০২ সালের প্রারম্ভ। চক্ষের সমক্ষে বারবৎসরের ঘটনারাশি ভাসিতেছে। এই বারবৎসরে নব্যভারতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সকলেই জানেন, বুঝিতেছেন। এদেশের অলিখিত জাতীয় ইতিহাস কখনও লিখিত হইলে, সকল জাতি এই যুগকে পতিত ভারতের উত্থানের পূর্ব্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিবেন। সংক্ষেপে এই যুগের সকল কথা ব্যাখ্যাত হইবার নয়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি আলোচনার

কোন প্রয়োজন নাই। তাহা প্রীতিকরও নহে, পরাধীন জাতির পক্ষে তাহা সহজও নহে। জাতীয় উন্নতি অবনতিই আমাদের লক্ষ্য। কিরূপে ভারতে একজাতিত্বের অভ্যুদয় হইবে, তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়।'

এই যুগে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা দেশ শাসন না করিলে, দেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে, দেশের উন্নতি অসম্ভব। স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনে এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। দলে দলে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও অকাতরে পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন,—নির্ভীকতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান নেসন-প্রমুখ দল যত অভাব বা দোষ ত্রুটির কথাই বলুন না কেন, * স্বায়ত্ত-শাসনের বার বৎসরের ইতিহাস যে আশাপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি সমূহের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টও এখন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। একদিনেই কোন লোক বড় হয় নাই, এক যুগেই কোন জাতি উন্নতির উচ্চ শেখরে উঠে নাই। নির্ব্বাচন প্রথার দোষ আছে, স্বীকার করি। কিন্তু এই উপায় ভিন্ন জাতির উত্থানের অন্য পথ নাই। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যেকের হাতেই কাজের ভার দিতে হইবে। একজনকে কর্তৃত্ব দিলে, সে শিক্ষা হয় না। সকলের শক্তির বিকাশ ভিন্ন—জাতির উন্নতি অসম্ভব। হাতে ধরিয়া শিশুদিগকে যেরূপ "ক খ" শিখাইতে হয়, গবর্ণমেণ্ট জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির ভার দেশীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, সেইরূপ, সকলকে রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের "ক খ" শিখাইতেছেন। কালে ইহাতে যে কি সুফল প্রসব করিবে, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমান করিতে সক্ষম। অল্প পরিমাণে ভারতের ব্যবস্থাপক সভায়, বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ নির্ভীক ব্যবস্থাপকের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইতেছি।

এই যুগের দ্বিতীয় শিক্ষা—জাতীয় মহাসমিতি। সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস, এ দেশের আত্মীয়তা-বর্দ্ধন ও সম্মিলনের আদি কারণ। বহুকাল পূর্ব্বে "সোপানে" লিখিয়াছিলাম, অত্যাচার ভিন্ন কোন জাতি জাগে না। ম্যাট্‌সিনির কারাবাস ভিন্ন ইতালী স্বাধীনতার মুখ দেখিত না, রবার্ট এমেটের ন্যায় শত শত বীর্য্যবন্ত বীরের রক্তপাত না হইলে,আজ আইরিস জাতি স্বায়ত্ত-

* See Indian Nation, April 15, 1895.

শাসন-আইনের (Home-rule) অধিকারী বলিয়া মহামতি গ্লাডষ্টোনের নিকট প্রতিপন্ন হইত না। এদেশে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের এক বিষম অঙ্ক। নরিশের নিন্দা করি না, কেন না, তিনিই প্রকারান্তরে এই কার্য্যের বা পবিত্র ভারত-সম্মিলনের প্রধান অধিনায়ক। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের পর হইতে একতার দিকে ভারতীয় জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই একতার পথে অগ্রসর হওয়ায় ইংরাজ-অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ইংরাজ-মনে অবিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিতেছে। অন্যদিকে এই অত্যাচার-অবিশ্বাস অঙ্কুর হইতেই আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের কারণ সকল জন্মিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস হইতে এ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ কত যে বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত করিতে পর্য্যন্ত উৎসাহ-ইন্ধন দিতেছেন। ক্ষতি, রক্তপাত, স্বার্থত্যাগ, কাজেই ভারতকে অনেক সহ্য করিতে হইতেছে। এইরূপ সহ্য করিতে করিতেই পতিত জাতির অভ্যুত্থান হয়। ছেলে বারম্বার আছাড় খাইয়াই দাঁড়াইতে শিখে। প্রথম ক্ষতি, প্রথম জীবনত্যাগ, প্রথম স্বার্থত্যাগ, প্রথম আত্মত্যাগ—তার পর জাতীয় উন্নতি; ইহাই জগতের চিরন্তন প্রথা। দেশোন্নতির মহাযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য, ভারতের বহু সুসন্তান, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, ইহা স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত। মহাযজ্ঞের আহুতিতে অনেকে সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতেছেন। জীবন বিসর্জ্জন আরো সময়-সাপেক্ষ। অনেক ব্যক্তি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। জাতীয় সমিতির প্রস্তাব সকলের (Resolutions) কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না; সে সকল গবর্ণমেণ্টের নিকট উপেক্ষিত হইতেছে, আমাদের মতে তাহা ভালই; কেন না তাহাতেই জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। অত্যাচার, অত্যাচার, অবিচার, অবিচার, আমরা কেবল ইহাই চাই। এই খানেই ভারতের বহুজাতির সম্মিলন সম্ভব। এইখানেই ভারতের অসংখ্য জাতির একত্ব সম্ভব। এইখানেই চিরপূজ্য স্বাধীনতা সম্ভব। পাড়ায় আগুন লাগিলে, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া, জাতি মান ভুলিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণে সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতে যখন অত্যাচারের মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখনই, কেবল তখনই ভারতের একতা সম্ভব। তখনই সকল লোক, জাতি মান ভুলিয়া এক স্থানে মিলিবে। জাতীয় মহাসমিতির কল্যাণে সেই অত্যাচার দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে; কি শুভক্ষণে জানি না, ইংরাজ রাজনীতি-

জ্ঞেরা অন্ধ কুহকে পড়িয়া, জাতীয় উন্নতির মূল নীতি ভুলিয়া, অত্যাচারের দ্বার দিন দিন আরো উন্মুক্ত করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায়, এ দেশের ভাবী উন্নতির বীজ নিহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও দরিদ্রদের প্রতি এই মহা সভার সহানুভূতি জন্মিতেছে না। জাতিভেদের শেষ অঙ্কুর উৎপাটিত করিয়া, আমরা সকলে সমান, সকলে ভাই, ভল্টেয়ার, রসো ও বুদ্ধের ন্যায় এই সাম্য নীতি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখনও উন্নত হয় নাই। এদেশের জনসাধারণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারে আজিও নিমজ্জিত; এই জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন এদেশের উদ্ধার নাই। সাম্যানলে আভিজাত্য ভাব পোড়াইয়া, এদেশের অসংখ্য দরিদ্রের জীবন গঠন করিতে হইবে। জীবন দিলে তবে জীবনের অভ্যুদয় হয়! জাতীয় মহাসমিতি কবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন! জাতীয় মহাসমিতি হইতে ভারতের জাতিভেদের শেষ অঙ্কুর যে দিন উৎপাটিত হইবে, এবং চরিত্র ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া এদেশের প্রবীণগণ, যখন নিম্নশ্রেণীর উদ্ধারের জন্য ও স্বার্থ রক্ষার জন্য, জীবন, প্রাণ, অর্থ, সামর্থ্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিবেন, সেই দিন মহাত্মা হিউম ও নারোজির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং ভারত পৃথিবীর উন্নত জাতি সমূহের মধ্যে সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। পূর্ব্বে এদেশে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষীর তালিকা একরূপ প্রায় শূন্য ছিল, কিন্তু জাতীয় মহাসমিতির এই কয়বৎসরের ইতিহাসে বহু কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশহিতৈষী বীরের অভ্যুত্থান হইয়াছে, দেখিতেছি। নারোজি, মেটা, বানর্জি, অযোধ্যানাথ, সুরেন্দ্রনাথ এখন এদেশের প্রকৃত সুসন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। উন্নতি-যুগের ইহা যে একটু পূর্ব্বাভাস, তাহাতে সন্দেহ কি?

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের পর জাতীয় মহাসমিতির উত্থান; আর কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর এদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান! কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্ম-ব্যাখ্যা এবং হিন্দু রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন, হিন্দু দেব দেবীর আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রথম সূচিত। তাঁহার তিরোধানের পর, সেই আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লইয়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শশধর প্রভৃতি অবতীর্ণ হইলেন। উদ্গার ভক্ষণে এদেশের নরনারী চিরাভ্যস্ত, বিশেষত, অনুকরণের যুগে। কেশবচন্দ্রের মৌলিকতত্ত্ব লইয়া, পুনরুত্থানের যুগে, কত কত তৃতীয়

চতুর্থ শ্রেণীর লোক যশ ও অর্থাগমের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন, কে সংখ্যা করিতে পারে? "যত ছিল নাড়া-বুনে, সব হলো কীর্ত্তুনে।" চতুর্দ্দিকে বক্তার দল গজাইয়া উঠিল, বঙ্গে একটা বিষম কোলাহল উঠিল। অধিকারী ভেদে উপদেশ প্রদানের শাস্ত্রীয় উপদেশটা গঙ্গায় ভাসাইয়া, কত রামু, শ্যামু, চামু আসরে নামিলেন। কবি ও তর্জ্জার লড়াই, গালাগালি, সময় বুঝিয়া সভামণ্ডপে আশ্রয় লইল। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ভারত অনৈক্যজালে জড়িত, সেই ভেদবুদ্ধির অভ্যুদয়ে, আবার ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রতিভাশালী ব্যক্তি, শীঘ্রই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের কুহক বুঝিতে পারিলেন; তাঁহারা অল্পে অল্পে এই দল হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শশধর-প্রমুখদল বেশ দশদিন যশ মান ও তৎসঙ্গে অর্থ রোজগারের পথ পাইলেন। স্বার্থ লইয়া ধর্ম্ম সংস্কার করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইল, অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহাদের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিল। এখন তাঁহারা কোন্ অন্ধকারকে আলোকিত করিতেছেন, কেহ জানে না। মধ্য হইতে সাধু ও ভক্তচূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসের দল জাঁকিয়া উঠিল। কিছু দিন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের স্রোত এতই প্রবল হইয়াছিল যে, কতিপয় সংবাদপত্রে ধর্ম্মপ্রচার, নাটকে থিয়েটারে ধর্ম্মপ্রচার, বক্তৃতায় ধর্ম্মপ্রচার—চতুর্দ্দিকে হরিসভা, ধর্ম্ম সভা। বোধ হইতেছিল, যেন এটা প্রকৃত ধর্ম্মের যুগ। ধর্ম্মোন্নতিতে কাহার না আনন্দ হয়? ধর্ম্ম ভিন্ন যখন জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব, তখন এ যুগের ধর্ম্মান্দোলনের কেন নিন্দা করিতেছি? আমরা কোন দিন মতের ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহি; চিরদিন জীবন্ত ধর্ম্মের পক্ষপাতী। ধর্ম্ম যখন জীবন-গত হয়, তখনই জীবন্ত; ধর্ম্ম যখন কথা ও বক্তৃতায় নিবদ্ধ, তখনই মৃত বা সাম্প্রদায়িক। ধর্ম্মের উন্নতিতে আনন্দিত আমরা তখনই, যখন দেখি, মানুষ হুজুগ ছাড়িয়া, নির্ব্বাক হইয়া, চরিত্রের ভিত্তিতে দিন দিন অটল হইতেছে। তুমি বারমাসে তের পার্ব্বণ কর, গির্জ্জায় যাও, নমাজ পড়, ব্রহ্মোপাসনা কর, বা গৈরিকে ভূষিত হইয়া, নিরামিষ-ভোজন-রত হইয়া যোগসাধন কর, যত দিন তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা না দেখিব, ততদিন তোমার ধর্ম্মলাভ হইতেছে, কখনও মনে করিব না; হুজুগপ্রিয় দেশে কেবল বাহ্য হুজুগ লইয়া মরিতেছ, মনে করিব। নীতি সাধনের বিষয়, রিপু সংযমের অধীন, ধর্ম্ম বিধাতার কৃপার দান। নীতি অর্জ্জন কর, রিপুদিগকে সংযত কর, বিধাতা বিশ্বাস ভক্তিতে তোমাকে উজ্জ্বল করিবেন। মানুষের সাধ্য নাই, কাহাকে ধর্ম্ম দিতে পারে,

চরিত্রে অটল করিতে পারে। মানুষ, মনুষকে যোগ শিক্ষা দিতে পারে, মন্ত্র দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম ও চরিত্র লাভ, নিজ চেষ্টা ও ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন হয় না। মানুষ, দেখিতেছি, কখনও নিরামিষ খাইতেছে, কখনও গৈরিক পরিতেছে, কখনও শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তোতাপাখীর ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে; কিন্তু সত্য সকল জীবনগত করিতে, ব্রত সকল পালন করিতে, অতি অল্পকেই সচেষ্টিত দেখিতেছি। তুমি বলিতেছ, হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "পুনরুত্থানের অর্থ কি? হিন্দুধর্ম্ম গিয়াছে ত গিয়াছে, আর উত্থিত হইবে না; থাকে ত আছেই, আবার উত্থান কি?" তুমি বলিতেছ, হিন্দুধর্ম্ম জাগিতেছে? জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুধর্ম্ম ডুবিয়াছিল স্বীকার কর কি? যদি কর, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, এখনও ডুবিয়া রহিয়াছে! এই যুগের ঘোর আন্দোলনে, কই, এদেশের কয়টা লোক প্রকৃত চরিত্রবান হইয়াছে? ধর্ম্মনিষ্ঠা, কই কয় জনের বাড়িয়াছে? রমণীজাতির প্রতি সম্মান করিতে কই এদেশের পুরুষেরা শিখিয়াছে? মিথ্যা-আচরণ, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, ব্যভিচার, কই এ দেশের লোকেরা ভুলিতে পারিয়াছে? জাল, জুয়াচুরি, হিংসা বিদ্বেষ যে দেশের ঘরে ঘরে বিচরণ করিয়া আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে, ধর্ম্মের প্রকৃত উত্থান সে দেশে হইতেছে, মনে করি না। একজন লোক একসময়ে লিখিয়াছিলেন, "এদেশের বড় বড় লোকের মাথার মূল্য ৫৲"—অর্থাৎ এ দেশের বড় বড় লোকও ৫৲ টাকা উৎকোচের বশ। কথাটা এতদুর সত্য না হইলেও, প্রতারণা, মিথ্যার রাজত্ব যে অব্যাহত প্রভাবে চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিয়াছি, ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়, মানুষেরা চরিত্র লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হয়; দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ দেশে সে লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। যে ভেদবোধের অঙ্কুর ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যে আভিজাত্য ভাব (Aristrocracy) এদেশের নিম্নশ্রেণীকে উন্নতি-সমুদ্রের পরপারে রাখিয়াছে, দেখিতেছি, বুঝিতেছি, জাগিতেছে এদেশে, সেই ভেদবোধ, সেই সর্ব্বনেশে আভিজাত্য ভাব। কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, সর্ব্বত্র বংশমর্য্যাদা, জাতিভেদ ষোল আনা দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য, জাতি বিশেষের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই যেন সর্ব্বত্র আয়োজন হইতেছে; সব মানুষ ঈশ্বরের, আপন আপন বিশেষত্বে মানব-সাধারণ সকলেই বড়, এ সকল শিক্ষা কল্পনার রাজ্যে দিন দিন আশ্রয় লইতেছে।

সুতরাং ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পুনরুত্থিত হইতেছে, কেমনে বলিব? এদেশের ধর্ম্মজ্ঞান, ও শাস্ত্রজ্ঞান এত নিষ্প্রভ হইয়াছে যে, বিবি বেসান্তকে লইয়াই মহা আনন্দের উচ্ছ্বাস চলিয়াছে, ধারণা নাই যে হিন্দু শাস্ত্র স্পষ্ট নিষেধ করে, ম্লেচ্ছের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে নাই। শশধর গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন গেলেন, শেষে পুনরুত্থানের আসর রাখিবেন, বিবি বেসান্ত!! ইহা উত্থান না পতন, বিধাতাই জানেন।

তবে পুনরুত্থানের হুজুগের মধ্যে শুভলক্ষণ কি একেবারেই নাই? আছে। এমন দিন ছিল, যে দিন, এ দেশের লোক ধর্ম্মের নামে মহা বিরক্ত হইত। ছেলে বদ্‌মায়েস হউক, দুষ্ট হউক, ক্ষতি নাই, ছেলে ধার্ম্মিক হইলেই বিপদ। কিছুদিন এই ভাব চলিয়াছিল। সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিলে কান্না পায়। জাতীয় ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং ধর্ম্মের প্রতি গভীর উদাসীনতা, সেই সময়ের প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। জাতীয় ভাষায় কথা বলিলেও লোকেরা ঘৃণা করিত, ধর্ম্মসমাজে গেলে বা ধর্ম্মের কথা বলিলেই লোকেরা উপহাস করিত। এই অবস্থা, এই যুগে কতক তিরোহিত হইয়াছে। পরম সৌভাগ্যের কথা, বঙ্কিম-চন্দ্র শেষ জীবনে এই মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব। এই বারবৎসরে এ কথা এ দেশে যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, এই কারণে, তাঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ধর্ম্মকথা বলিলে এখন আর লোক পূর্ব্বের ন্যায় উপহাস করে না। ধর্ম্মকথা শুনিলে এখন আর লোকেরা তত ঘৃণা করে না। ইহাই শুভলক্ষণ। ধর্ম্ম কথা বলিতে বলিতে, ধর্ম্ম কথা শুনিতে শুনিতে—কালে ধর্ম্মগত জীবন লাভ হইবে, আশা করি। আশা করি, নব্যভারতের আদি যুগে যে ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, কালে ইহার বাহিরের আড়ম্বর-জঞ্জাল বিদূরিত হইলে, চরিত্র ও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আরো শুভলক্ষণ আছে। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, নীতি রীতির প্রতি যে এদেশবাসীর প্রগাঢ় তন্ময়ত্ব জন্মিয়াছিল, তাহা এই যুগে কতক তিরোহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সকলই ভাল, পূর্ব্ব শিক্ষিত লোকের এই ধারণা ছিল, এখন প্রতীচ্য সকলই ভাল, এই ধারণা হইয়াছে। দেশীয় রীতি নীতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বাড়িয়াছে। "বঙ্গবাসী" এ স্থানে প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ভিন্ন, এই পতিত জাতির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ের একদেশদর্শী এই ভাববিপর্য্যয়ের পর যে সমন্বয়ের যুগ আগমন করিবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইংরাজ জাতি যত-

দিন এদেশে আছেন, ইংরাজি শিক্ষা ততদিন এদেশে প্রচলিত হইবেই হইবে; ইংরাজিশিক্ষা-বিস্তারের সহিত প্রতীচ্য দর্শনকাব্যের প্রতি যখন এদেশের অনুরাগ জন্মিবে, তখনই সমন্বয়ের যুগ আসিবে। এই সমন্বয়ের পূর্ব্বাভাস কতক পরিমাণে পাওয়াও গিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের লোক কেবল ব্রাহ্মণের নিকটই ধর্ম্ম কথা শুনিত। বেদে অন্যজাতির অধিকার নাই, এই শিক্ষা বদ্ধমূল ছিল। এই সমালোচ্য যুগে মহামতি রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, শাস্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে। কোন কোন লোক ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবি বেসান্তের ধর্ম্মপ্রচারে ও শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কই, আর কাহাকেও বিশেষ আন্দোলন করিতে দেখিতেছি না। ইহা সমন্বয় যুগ আগমনের যে পূর্ব্বাভাস, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন দলে দলে লোকেরা হিন্দু রীতি নীতির অনুসরণ করিতেছে—বহু শিক্ষিত লোক গুরুর নিকট দীক্ষা লইতেছেন, শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রাধ্যয়ন বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। এক ভগবদ্গীতার বহু সংস্করণ এই বার বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, ভাগবত, সংহিতা, দর্শন—সকল শাস্ত্রেরই বহুল প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। দেশীয় শাস্ত্র পাঠের ইচ্ছা, জাতিনির্ব্বিশেষে, সকলের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও শাস্ত্রে অধিকার নাই, এই প্রাচীন প্রবাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। অনেকেই শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে, আর একটী শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে। এই বার বৎসরের মধ্যে, গীতা সংহিতা, বেদ বেদান্ত, দর্শন কাব্য প্রভৃতির বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলা ভাষা দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। মহাত্মা শিশিরকুমার প্রভৃতি ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদকগণও আজ বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিবিধ শাস্ত্র তন্ত্র অনুবাদ হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এক সময়ে বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, যে কারণেই হউক, আজ তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এদেশের নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা, এই বার বৎসরে সকলই ধর্ম্মমূলক নীতিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম জীবনগত, বদ্ধমূল বা চরিত্রগত হওয়ার জন্য, এইরূপ, জাতীয় ভাষার পুস্তকগত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। এদেশে এ যুগে তাহা প্রভূত পরিমাণে হইয়াছে। ধন্য রমেশচন্দ্র, তিনিই এ পথের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার নাম

অক্ষয় হউক। পূর্ব্ব দুইযুগে এদেশে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার এবং দ্বিজেন্দ্র নাথ। এ যুগে, ধর্ম্মগ্রন্থ-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ভূদেব, শশধর, নগেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, জগদীশ্বর, চিরঞ্জীব, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, কত কত মহারথী। নিমেষে যেন এযুগের সকল গ্রন্থকারের লেখনী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা যে এদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া আশা হয়, নব্যভারতের দ্বিতীয় যুগে, এই দৃষ্টান্তে আরও কত ধর্ম্মগ্রন্থ-লেখক ও প্রচারকের আবির্ভাব হইবে।

আধ্যাত্মিক বিভাগে বঙ্গপ্রদেশ ভারতের শীর্ষস্থানে; কার্য্যবিভাগে বোম্বে ভারতের গৌরব। পার্সিজাতির অভ্যুদয় ভারতের যে পরম সৌভাগ্যের সোপান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভারতমাতার দুই পুত্র,—বঙ্গ ও বোম্বে। এই দুয়ের মস্তকে সমস্ত আশা ভরসা বিন্যস্ত;—একজন ধর্ম্মোন্নতি, নৈতিক উন্নতি লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে মাতোয়ারা; আর এক জন, সংসারের উন্নতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বার বৎসর ইহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক জন মস্তক, আর একজন যেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি। বুদ্ধি বিদ্যাতে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্যে, অধ্যবসায়ে ও সাংসারিক উন্নতিতে বোম্বাইবাসী শ্রেষ্ঠ। বোম্বে যখন কলকারখানায় ছাইয়া ফেলিয়াছে, বাঙ্গলা তখন এ সম্বন্ধে উদাসীনতার সুষুপ্তিতে ধ্যান-মগ্ন। যোগ-তপস্যা লইয়া থাকিতেই যেন বাঙ্গালী ভালবাসে। সংসারের উন্নতি, বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার উৎকর্ষ সাধন, নারোজি-প্রমুখ আদর্শ পার্সির নিত্যব্রত। দুয়ের সমন্বয় ভিন্ন ভারতের মঙ্গল নাই। এই যুগে উভয় দেশেই সেই সমন্বয়ের কতক সূত্রপাত হইয়াছে। বোম্বাইবাসী নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমাজ-সংস্কারে এখন একটু একটু মন দিতেছেন। বহুপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন বোম্বে মান্দ্রাজে সেই আন্দোলন চলিয়াছে। বোম্বের মালাবারি, বঙ্গের বিদ্যাসাগরের স্থান এই যুগে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর বঙ্গ প্রদেশ এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। বেঙ্গল-প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ইহার প্রধান উদাহরণ। কাচের কারখানা, ম্যাচের কারখানা, পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার প্রভৃতির কথাও আভাস দিতেছে, বঙ্গের বায়ু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জানি, এখনও বঙ্গের ধনিগণ কোম্পানির কাগজের মায়ায়, কোম্পানির কাগজের ছায়ায় নিদ্রিত; কিন্তু আশা হইতেছে, এই যুগে যে কিছু পরিবর্ত্তন

হইয়াছে, দৃষ্টান্তে আর এক যুগে তাহার সুফল ফলিবে। অর্থাৎ বাঙ্গলা বোধের ভাবে আরও অনুপ্রাণিত হইবে; তখনই পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্যক্ সুফল ফলিবে। এই সমন্বয়ের প্রধান প্রবর্ত্তক, বঙ্গদেশে বাবু অমৃতলাল রায়। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়াছেন, আশা করি, তাঁহার আদর্শে বঙ্গে নবযুগের অভ্যুত্থান হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বঙ্গ এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। এ যুগে এ বিভাগেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন,কিন্তু বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

শিল্প সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কালীঘাটের চিত্রই এ দেশের আদর্শ ছিল। এই যুগে আর্টষ্টুডিওর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সচিত্র পুস্তক পূর্ব্বে এদেশে বটতলা ভিন্ন কোথাও প্রকাশিত হইত না। এ যুগে সচিত্র পুস্তক প্রকাশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বাবু রোহিণীকান্ত নাগের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপে গমন, এ যুগের বিশেষ ঘটনা। কারুকার্য্যের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ উন্নতি হয় নাই। লোকের দৃষ্টি এ সকল দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, ইহাই উন্নতির পূর্ব্বাভাস বলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য আদর্শে সার্কাস কোম্পানী এ দেশে গঠিত হইয়া উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। ঢাকার বাবু শ্যামাকান্ত রায় এ সম্বন্ধে এ যুগের প্রধান আদর্শ। থিয়েটার এ যুগে যাত্রার স্থান অধিকার করিয়াছে।

এদেশবাসীর বেলুনে আরোহণ এ যুগের অন্যতর ঘটনা, দুঃখের বিষয়, ইহাতে সুফল ফলে নাই।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির তীব্র সমালোচনা এ যুগে বিশেষ ভাবে সূচিত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ইহাতে একতা সংস্থাপন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।

এ যুগের বিশেষত্ব—জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন। ভারতের অন্যান্য ভাষার একটু একটু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিই ভারতের এই যুগের প্রধান ঘটনা। পূর্ব্বতন যুগের অভ্যুদিত অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র,ভূদেব, বিহারীলাল এই যুগে বঙ্গভূমিকে দারুণ শোকে নিমগ্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারাই এ যুগের সাহিত্যসেবকদলের অগ্রণী ; ইঁহা-

দের আশ্রয়ে, ইঁহাদের সহায়ে, ইঁহাদের আদর্শে বাঙ্গলায় অগণ্য অসংখ্য লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, যোগেন্দ্র নাথ, কালীপ্রসন্ন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রজনীকান্ত, শিবনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ আজও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় জীবনকে ধন্য করিতেছেন; তাঁহাদের সহিত মিলিত—আজ কালকার বহু শিক্ষিত, সুবুদ্ধি-মান, উৎসাহী সুলেখকগণ। ইঁহাদের চেষ্টায় বহু সাপ্তাহিক, বহু মাসিক পত্রিকা চলিতেছে। এই যুগে যত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, পূর্ব্বে কোন যুগে এরূপ হয় নাই। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, সময়, ভারত-বাসী, পতাকা, নববিভাকর, বঙ্গনিবাসী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা এদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ, সাধারণী, সুরভি, ভারতমি-হির ও সহচর যে দেশের প্রধান পাঠ্য বাঙ্গালা পত্রিকা ছিল, সে দেশে এতগুলি পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া বিশেষ পরিচয় দিয়াছে, বাঙ্গলা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সহচর, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও সময় এখনও অদম্য উৎ-সাহে, অদম্যতেজে, বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা এখন দোকানী পসারীর ঘরে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গলা পত্রিকা এখন দেশে একটা শক্তিরূপে প্রদীপ্ত। উৎকর্ণ হইয়া ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ এখন বাঙ্গলা ভাষার মধুর কথা শ্রবণ করিতেছে। মাসিক-পত্রিকারও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন ও বান্ধব যদিও এই যুগের পূর্ব্বেই সময়ের গহ্বরে লুকায়িত হইয়াছে, কিন্তু বহুপূর্ব্ব যুগের তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী, পূর্ব্ব যুগের ভারতী আজও অশেষ যত্ন ও গৌরবে পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদীও সাময়িক পত্রিকার গৌরব-স্বরূপ। এ যুগের নবজীবন ও প্রচার যদিও কালের গর্ভে ডুবিয়াছে, কিন্তু অল্প বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় নাই। এ যুগের জন্মভূমি, সাধনা, সাহিত্য, অনুসন্ধান, শিক্ষা-পরিচর, চিকিৎসা-সম্মিলনী, সমীরণ ও চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রিকা অধ্যব-সায়, কৃতিত্ব এবং যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। দাসী, তৃপ্তি, পুরোহিত ও পূর্ণিমা প্রভৃতি পত্রিকা অল্পকালের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরো বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে না বলিয়া উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই যে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশে বিশেষ কোন চেষ্টা হইত না। দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাস পাশা খেলিয়া সময় কর্ত্তন করিত। এ যুগে দেশে অসংখ্য সভা ও সাধারণ লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে। এক কলিকাতাতে সাবিত্রী, বিদ্যাসাগর, চৈতন্য, সিকদার-বাগান-বান্ধব, কম্বলি টোলা প্রভৃতি বহু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচারুরূপে চলিতেছে। পল্লিগ্রামের বহুস্থানে অসংখ্য লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে পূর্ব্বে পাঠকশ্রেণী ছিল না বলিলেই হয়, এখন আংশিকরূপে যে পাঠকশ্রেণী অভ্যুদিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পর যুগে এ সম্বন্ধে আরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, আশা করি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের বিশেষত্ব এই, কলেজে থাকিতে থাকিতেই ছাত্রবর্গ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে,পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না। কিন্তু এ যুগে এই বিশেষত্ব,এ দেশের কৃতবিদ্য ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কতক প্রবেশ লাভ করিতেছে। বহু এম-এ,বি-এ উপাধিধারী ব্যক্তি এখন বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিতেছেন। বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু বরদা চরণ মিত্র প্রভৃতি অসাধারণ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ জাতীয় ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণই দেশের আশা ভরসা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, আশা করা যায়, কালে এদেশের অধিকাংশ কৃতবিদ্য জাতীয় ভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিবেন। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের যত্নে "সাহিত্য-পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য এরূপ চেষ্টা এদেশে কেবল এ যুগেই হইয়াছে। এ যুগে কত মৌলিক গ্রন্থ যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে বঙ্গ-দর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর সেরূপ হয় না, ইহা যাঁহাদের ধারণা,আমরা বলিতে বাধ্য যে, এ যুগের সহিত তাঁহারা বিশেষরূপ পরিচিত নহেন। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে, ইহা প্রাচীন কথা। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, যাহা নাই নব্যভারতের প্রথমযুগে, তাহা নাই পৃথিবীর কোন দেশের কোন যুগে। রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আমাদের দেশে এই যুগে সেইরূপ হইয়াছে। সমসাময়িক

লোকেরা সমসাময়িক লোকদিগের প্রতিভা ও মহিমা বুঝিতে অনেক সময়েই অক্ষম; নানা কারণে সন্দেহ, হিংসা ও অবিচার-কুজ্ঝটিকায় তাঁহাদের মন মলিন থাকে। এই কারণে, সোণার বঙ্কিমচন্দ্রকেও পৃথিবীর অসাধারণ অমর কবিগণের সম আসনে বসাইতে অনেকে সংকুচিত ও কুণ্ঠিত। আমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে চাই, যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে কোন দেশের যে কোন পুস্তকের সমতুল্য। এ কথা লইয়া এখন পরশ্রীকাতর-ব্যক্তিরা, পাণ্ডিত্যের দোহাই দিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এ কথার সুবিচার হইবে। নাম করিতে চাই না, করিয়া কাজই বা কি? এ যুগের রচিত বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব, জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্যলীলামৃত, ভূদেব ও রাজকৃষ্ণের বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তক, চন্দ্রনাথের ত্রিধারা ও হিন্দুত্ব, নবীনচন্দ্রের রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র, যোগীন্দ্রনাথের মাইকেলের জীবন-চরিত এবং আনন্দচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার, রাজকৃষ্ণ, গিরীন্দ্র-মোহিনী, গোবিন্দদাস, কামিনী, মানকুমারী ও মৃণালিনী প্রভৃতির গীতি-কবিতা যে কোন দেশের যে কোন প্রধান লেখকের যোগ্য। এ যুগে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কোন যুগে এদেশে তেমন হয় নাই। ইতিহাসে সে সকলের কথা চির-অঙ্কিত থাকিবে।

কিন্তু হইলে কি হয়, এখনও এ দেশের বহুপ্রবীণ ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উদাসীন। বহু সভাসমিতিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা চলে না, আদালত হইতে বাঙ্গালা ভাষা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে, উড়িয়া ও আসামীয় ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ হইয়াও, গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায়, স্বতন্ত্র আকার ধরিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষের ন্যায়, ভাষা-বিদ্বেষ জন্মাইতে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আমাদের দেশের ধুরন্ধরগণ একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজী ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হইবে। এই মতভ্রান্তি বিদূরিত না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। জাতীয় ভাষা ভিন্ন জাতিত্ব গঠন হয় না। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষাভাবে একজাতিত্ব গঠনের চেষ্টা এদেশে তদ্রূপ হইতেছে না। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন তাহা হওয়াও অসম্ভব। জাতীয় ভাব জাতীয় ভাষার ভিতর দিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে অণুপ্রবেশ করাইতে হইবে, নচেৎ জাতিত্ব গঠিত হইবে না। এ সকল কথা আমরা বারম্বার বলিয়াছি; এখন আর বিশেষ করিয়া বলিব না। এ বিষয়ে জাতীয় মহাসমিতি পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন।

এ যুগে স্ত্রীশিক্ষা এবং পল্লিগ্রামের উন্নতির জন্য বঙ্গে বহু সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সুচারুরূপে চলিতেছে। সাধারণের উন্নতি এবং দরিদ্রের সেবা-ব্রতে অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। দারিদ্র্য-সেবার জন্য এই যুগে দাসাশ্রম ও অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহাত্মা ভূদেব বহু টাকা প্রদান করিয়া এ দেশে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের শিক্ষার জন্য পুনাতে শ্রীযুক্তা রমাবাই এবং বঙ্গে শ্রীযুক্ত শশীপদ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে এখন অনেক সহৃদয় ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইতেছেন। এ সকল একজাতিত্ব গঠনের পূর্ব্বাভাস। এক জাতিত্ব গঠন ভিন্ন দেশের উন্নতি অসম্ভব।

একজাতিত্ব গঠনে চেষ্টা করিবেন, ব্রাহ্মসমাজ, এক সময়ে আশা ছিল। কতক করিতেছেনও বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার কার্য্যে যেরূপ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, গঠনকার্য্যে তদ্রূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেছেন না বলিয়া আমরা দুঃখিত আছি। এই যুগেও ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত গঠন-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এ সমাজে কোন প্রথা, কোন রীতি, কোন অনুষ্ঠানই স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-স্রোতের প্রাবল্যে সমস্ত গঠন-কার্য্য ভাসিয়া যাইতেছে। দলের উপর দল বৃদ্ধি হইতেছে, পরচর্চ্চা পরনিন্দা, বিদ্বেষ, সমালোচনার নামে অবাধে রাজ্য বিস্তার করিতেছে। ধর্ম্ম গ্রহণের সময় যাঁহারা, পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুগণের চক্ষের জল তুচ্ছ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা-সমরে কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন! সম্মুখে কাহারও দোষ বলিবার সাহস নাই, অসাক্ষাতে অনেকেই নিন্দা-ঘোষণায় উৎফুল্ল! এই কারণে, বিদ্বেষ ভাব দিন দিন অনেকের অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে। আপন মতে না চলিলেই লোক বদ্মায়েস হইল!! আপন দলের গোড়ামী বজায় রাখিতে যাইয়া, অন্যের বিশেষত্বে, এইরূপে, এখন অনেকেই দারুণ আঘাত করিতেছেন। পরস্পরের নিন্দা প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ব্যক্তিগণও সাধারণের নিকট তুচ্ছ ও ঘৃণ্য হইতেছেন। অসংখ্য দলের মধ্যে দুই প্রবল দল দেখা যাইতেছে। এক পক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপ্রতিহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, আর একদল, গুরু বা নেতার চরণে সমস্ত আশা ভরসা উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিষয়ে আদর্শ, কিন্তু দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে এই সমাজও ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা পরিহার করিয়া নেতৃত্বের সাদর অভ্য-

র্ণনা করিতেছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আভিজাত্য-ভাব, নানা রূপে (Aristocracy) এখানেও প্রকারান্তরে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ইহার পরিণাম কি, অনুমান করিতে পারি না; তবে একথা ঠিক, এই সমাজ বর্ত্তমান নেতা বা পুরোহিত নির্ব্বাচনে "সাধারণত্বের" বিশেষত্বে যে পদাঘাত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তা যাউক। আভ্যন্তরীণ গঠন কার্য্যেই যখন ব্রাহ্মসমাজ অকৃতকার্য্য, তখন দেশের অসংখ্য জাতি ভাঙ্গিয়া একজাতি গঠনের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, জানি না। দেশের নবোত্থিত হিন্দু-সম্প্রদায় পুনঃ জাতিভেদ সংরক্ষণে সচেষ্ট, ইংরাজি-শিক্ষা-বিস্তারের প্রবল স্রোতের মুখে তাহা সম্ভব কি না,জানি না; তবে ইহা জানি, হিন্দুসমাজের মধ্যে লালিত পালিত, হিন্দুভাবাপন্ন,হিন্দু-প্রশংসা-প্রত্যাশী ব্রাহ্মসমাজে এই জাতিভেদ পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা বদ্ধমূল হওয়ায়,* দেশের আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। তদুপরি, হিন্দু-পুনরুত্থানের স্রোতের হুজুগও অল্পাধিক পরিমাণে এই সমাজে প্রবেশ করিতেছে। আত্মার সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলন সম্ভব, ইহাই জগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত নূতন কথা। কিন্তু এখন আবার গুরুবাদের আলোচনা ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাতে চলিয়াছে, এবং অনেক লোক আবার "গুরু-ব্রহ্ম" বলিতে আরম্ভ করিয়া, ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূলে আঘাত করিতেছেন, এবং গুরুর পদতলে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ সৃষ্টি করিতেছেন। গুরুবাদের পর যে অবতারবাদ পুনঃ যৌক্তিকতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হইবে না, কে জানে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সমাজের গতি এখন অনেকটা পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য ভাব-সমন্বয়ের বিরুদ্ধে, প্রাচীন হিন্দুত্বের একদেশদর্শিতার দুর্গের দিকে। পূর্ব্বে পৃথিবীতে অনাবিল পবিত্র একেশ্বরবাদ, যে সকল কারণে সাম্প্রদায়িকতা, গুরুবাদ ও অবতারবাদের মত-পঙ্কে মলিন হইয়া গিয়াছে, আজিও সে সকল কারণ বর্ত্তমান; বর্ত্তমান কেন, ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই স্রোতের গতি প্রতিহত না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের নিকট সমন্বয়ের, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য ভাব-সম্মিলনের—একজাতি গঠনের আশা কিছুতেই করা যাইবে না।

কিন্তু একথা প্রতি নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজ এদেশের বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির মূল। জাতিত্ব গঠনের মূল যদি

* See *Indian Messenger*, August 5, 1894—"Caste in the *Brahmo Samaj*."

জাতীয় ভাষা ও জাতীয়ধর্ম্ম হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ এই উভয়কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া দেশের যে কি মহৎ উপকার করিতেছেন, সংক্ষেপে ব্যক্ত করা কঠিন। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম ভিন্ন এক জাতি সংগঠন অসম্ভব। একেশ্বরবাদ যেমন ভারতের সকল ধর্ম্মের সার; সংস্কৃত ভাষা, তেমনি ভারতের সকল ভাষার মূল। এই একেশ্বরবাদই নামান্তরে,প্রাচীন ও নবীনত্বের সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম; এই সংস্কৃত ভাষাই বর্ত্তমানে প্রাচীনও নবীনত্বে সরলীকৃত বাঙ্গালা ভাষা। এই দুয়ের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ এদেশকে রূপান্তরিত করিতেছেন। ইহাতে যে সুফল ফলিবার, তাহার গতি প্রতিহত হইবে না; বিশেষ চেষ্টাতেও এযুগে তাহা হয় নাই, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বই কি?

প্রিয় এবং অপ্রিয়, ভাল এবং মন্দ, আশা এবং নিরাশা—সকল দিকের সকল কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। ইঙ্গিতে বলিয়াছি, নব্যভারতের প্রথম যুগের সকল কার্য্য, সকল ঘটনা ভাল না হইলেও, সকল ঘটনাতেই উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। মৃত দেশ যে একটু একটু জীবন সঞ্চারের পরিচয় দিয়াছে, সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বহু যুগ-যুগান্তরের পর ভারতে যেন একটু একটু আশা-পবন বহিতেছে। সাম্য এবং বৈষম্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্র হইতে নব্যভারতের নবজীবন সঞ্চারিত হইবে,আমরা আশা করি। তবে বলিতেই হইবে, ঘোর অস্থৈর্য্যের ভিতর ভারত-সমাজ এখনও নিমজ্জিত। বর্ত্তমান অবস্থাকে সম্পূর্ণ উত্থানও বলি না, সম্পূর্ণ পতনও বলি না। পতন-উত্থানের মধ্যবর্ত্তী অস্থৈর্য্য-উপত্যকার ঘোরান্ধকারের মধ্যেই উন্নতির দীপ্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে; মনে হইতেছে, উন্নতি-সূর্য্য অদূরে। কিন্তু সুসভ্য ও সমুন্নত দেশের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া, ধীরভাবে আলোচনা করিলে, অসংখ্য অভাবই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই; মনে হয়, এখনও ভারত দিশেহারা, লক্ষ্যশূন্য,—সহায় নাই, নেতা নাই,—প্রজাশক্তি নাই, সমাজশক্তি নাই। নাই—নাই—নাই, সকলই যেন নাই। ধৈর্য্য নাই, অধ্যবসায় নাই, চরিত্র নাই, সাহস নাই, বীর্য্য নাই, ধর্ম্ম নাই,—নাই—নাই—নাই, সকলই যেন নাই! নাই-হাটে কেবল গণ্ডগোল আছে,—একতা নামক মহাশক্তি এখনও বহুদূরে, স্বাধীনতা নামক স্বর্গীয় পবিত্র শক্তি কোথায়, কে জানে? জাতিত্ব নামক মহাবীর এখনও ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন; ভাষার সমন্বয়, ধর্ম্ম সমন্বয়, স্বার্থ ও পরার্থ সমন্বয়, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য সমন্বয়, জ্ঞানী মূর্খ সমন্বয়, ধনী দরিদ্র সমন্বয়—এ সকল এখনও বহুদূর। এই কূলহীন বিষম অস্থৈর্য্য-সাগরে

আছে তবে কি ? আছে কেবল ব্রহ্মকৃপা !! ব্রহ্ম কৃপাই নিরাশার আশা, অন্ধকারের আলো। এই ব্রহ্মকৃপাতেই নব্যভারত উন্নত হইবে, ধর্ম্ম ও চরিত্রধনে অধিকারী হইবে। এই ব্রহ্মকৃপার প্রচারই এ যুগের উন্নতির পূর্ব্বাভাস। এই ঘোরান্ধকারে কেবল চতুর্দ্দিকে শুনিতেছি, কে যেন মাভৈ মাভৈ রবে গাহিতেছেন, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" আকাশ নক্ষত্র জগৎ ছাইয়া কেবল এই বিশ্ববিজয়ী কৃপার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে উঠিতেছে। সকলে জ্ঞাত অজ্ঞাত অবস্থায় ঐ সুরে মজিতেছে। সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঐ সুরে যোগ দিতেছে। সুপ্তোত্থিতা ভারত-মাতা ঐ সুরে ও ধ্বনিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন। তোমরাও ভাই, বন্ধু, দেশ কাঁপাইয়া সকলে বল—"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" বল বল, বীর্য্য বল, চরিত্র বল, ধর্ম্ম বল, প্রেম বল, পুণ্য বল, নব্যভারতে সমস্ত অবতীর্ণ হইবে ব্রহ্মকৃপায়। তবে সমস্বরে মান অভিমান ভুলিয়া গাও, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" নব্যভারত যুগান্তরে, ব্রহ্মকৃপায়, অবশ্য নবজীবন লাভ করিবে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩০২।

মানব-দেবতা বা রামমোহন। *

যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে পৃথিবীর দেশ ও সমাজের দূষিত বায়ু আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন তন্মধ্যে একজন। আমেরিকা, ইতালী এবং ভারতের বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ প্রধানতঃ তিন ব্যক্তি—আমেরিকার থিওডোর পার্কার, ইতালীর ম্যাট্‌সিনি এবং ভারতের রামমোহন। ইঁহারা তিনজনই মানবদেহে ঐশী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, তিন জন পৃথিবীর তিন প্রধান ভূভাগে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজের উদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনের অসাধারণত্বের কথা ভাবিলে আমরা স্তম্ভিত হই, ইঁহাদের মহত্ত্ব স্মরণ করিলে মোহিত হই। ইঁহারা তিন জনই মানব-দেবতা।

সৃষ্টির প্রতি বস্তুতেই বিশেষত্ব বিদ্যমান। আপন বিশেষত্বে প্রতি বস্তুই সর্ব্ব প্রধান। প্রতি মানুষ আপন বিশেষত্বে প্রধান, ইহা চিন্তার এক দিক্, সৃষ্টির এক বিভাগ। আর এক বিভাগ আরও মনোরম, আরও সুন্দর। সে বিভাগের বিশেষত্বে আবার অসাধারণত্ব আছে। পৃথিবীর সমস্ত বিশেষত্ব

* ২৬ শে ফাল্গুন, ১৩০১—এই প্রবন্ধটী রামমোহন রায় রুমে পঠিত হইয়াছিল।

সেখানে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ঘনীভূত। পৃথিবীর সকল বর্ণ যেমন রামধনুতে প্রতিফলিত, পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব, সেইরূপ, সেই স্থলে প্রতিবিম্বিত। সে কিরূপ কথা, বলিতেছি।

পৃথিবীতে বড় কে, ছোট কে? মহৎ কে, সামান্যই বা কে? নিজ অনুভূতির আদর্শানুসারে মানুষ কাহাকেও বড় বা মহৎ, কাহাকেও ছোট বা সামান্য বলিয়া অভিহিত করে; প্রকৃতপক্ষে বড় ছোট বিচারের আর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-যন্ত্র নাই। দেখিতে পাই, সংসারে কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ ভক্ত, কেহ বা সংসারী। ইহার মধ্যে কে বড়, কে ছোট? প্রতিভা বা বুদ্ধি, মনোবল বা শারীরবল, ইহার মধ্যে কে বড়, কে বা সামান্য? যাহার আদর্শ যেরূপ, সে তাহাকেই আদর করে, তাহাকেই বড় বলে। প্রকৃত পক্ষে, এই সকলের মধ্যে বড় ছোট বা সামান্য অসামান্য, এ বিচার চলে না। বিধাতার সৃষ্টিতে সকলেরই প্রয়োজন আছে, সুতরাং প্রয়োজনানুসারে সকলেই আপন আপন বিভাগে বড় বা মহৎ। যত গুণ, যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি—ইহার মধ্যে কেহই কাহার অপেক্ষা হীন নহে; আপন আপন বিভাগে সকলেই মহৎ। রাজা কর্ত্তৃত্বশক্তিতে প্রধান, প্রজা আনুগত্যে প্রধান, মন্ত্রী বুদ্ধিবলে প্রধান, সেবক সেবাতে প্রধান। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানী জ্ঞানে, কর্ম্মী কর্ম্মে, বিশ্বাসী ভক্তিতে, কবি কবিত্বে প্রধান। এ এক রাজ্যের কথা। সাধারণতঃ পৃথিবীর সৃষ্ট জীব জন্তু সকলই এইরূপ নানা বিশেষত্বে পূর্ণ। কিন্তু এই সকল বিশেষত্ব, কোন কোন স্থলে আবার ঘনীভূত হইতে দেখা যায়—সকল নদী, সকল উৎস মিলিয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিতেছে। দেখা যায়, জ্ঞান আর প্রেম, বিশ্বাস আর ভক্তি, অধ্যবসায় আর কর্ম্ম, বুদ্ধি আর প্রতিভা, মনোবল বা ইচ্ছাবল—সব যেন একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে; দেখা যায়—কোথাও কোথাও সৃষ্টির সকল বিশেষত্ব একাধারে পরিশোভিত, পৃথিবীর সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য্য একত্র প্রতিফলিত। প্রতি বস্তুর বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যে শোভা আছে, অস্বীকার করি না, কিন্তু সকল বিশেষত্ব, সকল বৈচিত্র্য যখন একত্র সন্নিবিষ্ট, তখনকার শোভা অতুল। পৃথিবীর ঝরণা, উৎস, নদ নদীর শোভা বর্ণনার আয়ত্তাধীন, কিন্তু সেই সকল মিলিয়া যখন মহাসাগরে পরিণত, তখন তাহা বর্ণনা করিবে সাধ্য কার? সে শোভা অতুল, অকথিত, অজানিত, অশেষ, অব্যক্ত।

প্রকৃতিতে যাহা মহাসাগর, মানবে তাহা মহাপুরুষ। সকল বাষ্প, সকল

মেঘ এবং সকল নদ নদীর জল মিলিয়া যেমন মহাসাগরের উৎপত্তি, সেইরূপ, সকল মানুষের সকল বিশেষত্ব, সকল মনুষ্যত্ব মিলিয়া মহাপুরুষ। পুরুষকারও স্বীকার করি, অথচ মহাপুরুষবাদও মানি। সকল ফুলের আঘ্রাণ, সৌন্দর্য্য, সুষমা যিনি একত্র সমাবেশ করিতে পারেন, সকল আধারের বিশেষত্ব যিনি আত্মস্থ করিতে পারেন, সকল শক্তি যিনি আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ—তিনিই অসাধারণ ব্যক্তি বা মহাপুরুষ। তাহা পারে কে, পারে না বা কে? যে উপেক্ষা করে,সে-ই পারে না; যে যত্নসহকারে গ্রহণ করে, সে-ই পারে। প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য,সকল বিশেষত্ব মানুষের নিকট প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে,—আয়ত্ত বা আত্মস্থ করে না মানুষ কেবল উপেক্ষায়। মানুষের শক্তি সমূহ অনুশীলনে (culture) জাগ্রত হয়; বুদ্ধি বল বা প্রতিভা বল, জ্ঞান বল বা প্রেম বল, মানসিক বল বল, বা শারীরিক বল বল, অনুশীলনে,সাধনায় সকলই জাগ্রত হয়। বিনা অনুশীলনে মানুষের অন্তরনিহিত ঘুমন্ত শক্তি জাগে না। যত চর্চ্চা, যত মার্জ্জনা, যত অনুশীলন, ততই শক্তির স্ফূর্ত্তি। এক শক্তি-সাগর হইতে প্রাপ্ত শক্তি সকলেরই একরূপ, অনুশীলনের নূনাধিক্যে মানুষের অসাধারণত্ব, বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত হয়। যাঁহারা সকল শক্তির সম অনুশীলন করিতে পারেন, তাঁহাদের সকল শক্তিই জাগ্রত হয়, অথবা তাঁহারা সকল বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাকেই মহাত্মা পার্কার সমঞ্জসীভূত উন্নতি (Simultaneous development) বলেন। হেলায় মানুষ রতন হারায়। প্রত্যহ যে সূর্য্য গগনে উঠে, প্রত্যহ যে ফুল বাগানে ফুটে,—তাহা সকলের ভোগ্য; কিন্তু যে উপেক্ষা করে, তুচ্ছ করে, তাহার নহে। ঐ শোভা দেখিয়া কত লোক স্বর্গে যায়, কিন্তু কত লোক যেমন ছিল, তেমনই থাকে। এরূপ হয় কেবল অবহেলায়, তাচ্ছল্যে। বিধাতার বিধানের কথা যদি বলিতে চাও, তবে তাহা সকলের পক্ষে সমান। অঙ্কুরে মানুষের সকল শক্তি সমান। অনুশীলনে কাহারও জাগ্রত, এবং তদভাবে কাহারও সুষুপ্ত। মানুষ, মানুষ হউক, বিধাতার ইচ্ছা; একদিন নিশ্চয় মানুষ মানুষ হইবেও তাঁহারই ইচ্ছায়। এখন যে মানুষ পাপে ডুবিতেছে বা হীন কাজে মজিতেছে, সে কেবল অবহেলায়। অনুশীলনের আয়ত্তাধীন কি নয়, জানি না। অধ্যবসায়ে পরিশ্রমে যে কি সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝি না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথায় বলে—"গাইতে গাইতে গায়ক, আর বাজাইতে বাজাইতে বাদক।" বাস্তবিক কথাটা ঠিক। যত মস্তিষ্ক চালনা করিবে, ততই বুদ্ধি

মার্জ্জিত ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, যত হস্ত পদ চালনা করিবে, তত কার্য্যকরী শক্তি বাড়িবে। বুদ্ধি বা প্রতিভা, জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, প্রেম বা দয়া—এ সকলই অনুশীলনে উপার্জ্জিত হয়। "মানুষ যাহা হইয়াছে, চেষ্টা করিলে মানুষ তাহা হইতে পারে"—এক জন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন। গভীর চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের শক্তি সমূহ সুষুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিচার আজ থাকুক্।

মহাপুরুষবাদ,সহজ কথায়, এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এক এক সময়ে দেশের প্রচলিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য—এক এক প্রকার বায়ু সৃজন করে। সেই বায়ুরাশি এক এক স্থানে সঞ্চিত হয়; অথবা এক এক জন আত্মস্থ করেন। সেই বায়ুরাশিতে ডুবিয়া মজিয়া এক এক জন সকলের বিশেষত্বে, অসাধারণত্বে মহাশক্তি, মহাবল লাভ করিয়া ধরায় মস্তক উত্তোলন করেন। তাঁহাদের পরাক্রমে জগৎ কম্পিত, মোহিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহাদের প্রভাবে পৃথিবীর প্রবাহিত বায়ু আমুল পরিবর্ত্তিত হয়। ইঁহারাই মহাপুরুষ, ইঁহারাই মানব-দেবতা।

সকলের সকল বিশেষত্বে যে মহাপুরুষদিগের জন্ম, সে মহাপুরুষদিগের বিশেষত্ব কি? তাঁহাদিগের ভিতর এমন কি শক্তি দেখা যায়, যাহা আর কোথাও মিলে না? পৃথিবীর সকল বিশেষত্ব—পুরুষের বীর্য্য, নারীর প্রেম, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, বালকের কোমলত্ব, সব যখন মিলিয়া গিয়াছে,—জ্ঞান প্রেম পুণ্য, যোগভক্তি কর্ম্ম যখন এক স্থানে সম্মিলিত,সত্ত্ব রজঃ তমঃ বা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যখন জীবন-প্রয়াগে সম্মিলিত, তখন কি বিশেষত্বের অভ্যুদয় হইতেছে? বিশেষত্ব—একে তিন, তিনে এক হইয়া এক অদ্বৈত মহাশক্তির উদয়। সেই শক্তিই মানব-দেবত্ব। সেই শক্তিই চরিত্র। সেখানে সাহস, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম মিলিয়া মহা চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে। তাহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবী মুষ্টিমেয়, ধরা সেখানে শরার ন্যায়। সে চরিত্র-শক্তির সংস্পর্শে সাধারণ মানুষ আত্মহারা, দিক্ভ্রান্ত, লক্ষ্য-শূন্য। মানব পরিবার সে চরিত্র-বলের যেন হাতের ক্রীড়ার বস্তু। সেখানে বক্তৃতা নাই, অথচ আন্দোলন আছে,—সেখানে মানুষকে কেহ চালায় না, অথচ সেই শক্তির অনুসরণ করে; যেন মানুষ আপনভোলা। সিজার, আলেকজেণ্ডার, নেপোলিয়নের দর্প চূর্ণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রের প্রতাপ কখনও খর্ব্ব হয় না। ঈশা মরিয়াও পৃথিবীতে চিরজীবিত, শাক্য নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও

চিরসঞ্জীবিত। এই মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবেই ধরা ধন্য—পৃথিবী পরিত্রাণ পাইয়াছে। কারারুদ্ধ এবং নির্ব্বাসিত করিয়া কি অষ্ট্রীয়া ম্যাট্‌সিনির প্রতাপ খর্ব্ব করিতে পারিয়াছিল? অথবা শত্রুতা সাধন করিয়া আমেরিকা পার্কার-শক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল? খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে য়িহুদী জাতির কুসংস্কার, শাক্যের বিরুদ্ধে মারপিশূনের প্রবল আধিপত্য, শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে সংসারাসক্তি, পার্কারের বিরুদ্ধে দাস ব্যবসায়ী দলের চক্রান্ত, ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার প্রবল প্রতাপ, এবং রামমোহনের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজের মহাপরাক্রম কি জঘন্য কাজ করে নাই, জানি না; কিন্তু কোথায় সে সকল জঘন্যতা, আর কোথায় ইঁহাদের তেজ, সাহস, বীর্য্য। অগ্নিতে যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইঁহাদের চরিত্রতেজে, তীব্র আন্দোলন, দারুণ অত্যাচার তেমনই ভস্মীভূত হইয়াছে। জাহাজ যেমন অবিরাম গতিতে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থলে চলিয়া যায়, কোন বাধায় ফেরে না, ইঁহারাও তদ্রূপ সকল বাধা, সকল বিপদ অমানুষী ধৈর্য্য সহকারে ভেদ করিয়া লক্ষ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। কাহারও সাধ্য নাই, ইঁহাদিগকে থামাইতে পারে। ইঁহারা অধিক কথা বলেন না, তবুও মানুষ মজে; ইঁহারা কাহাকেও চালাইতে চান না, তবুও মানুষ বশ হয়। এমন বশ হয় যে, দিবালোকে শ্রেণীবদ্ধ প্রজাপুঞ্জকে বন্দুকের গুলিদ্বারা প্রাণনাশ করিয়াও অষ্ট্রিয়া-গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্‌সিনির অনুরক্ত দলকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। যে শক্তিতে এই সকল মহাপুরুষেরা অনুপ্রাণিত, সে শক্তির তেজে পৃথিবী অবনত-মস্তক। ইঁহারা কামনা-রহিত কামনা-যুক্ত, বাসনা-বিবর্জ্জিত বাসনাযুক্ত। ইঁহারা ফল-শূন্য ফলবাদী, ইঁহারা সংসারশূন্য সংসারী। ইঁহারা ব্যক্তিত্ব মানেন না, সমষ্টি মানেন; ইঁহারা পরিবার ত্যাগ করেন, বিশ্ব-সংসারে ঘর বাঁধেন। ইঁহারা কোনরূপ ফল না পাইয়াও শরীর বিসর্জ্জন দেন; ইঁহারা কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া সকলের দাস হন। সমগ্র পৃথিবী ও মানব-সমাজ তাঁহাদের ভালবাসার জিনীস। তাঁহাদের সংস্পর্শে, তাঁহাদের আদর্শে জগৎ রূপান্তর ধারণ করে। ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রভাবে ধরা পরিবর্ত্তিত হয়,—বায়ুর গতি এবং নদীর স্রোত ফিরে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর লোক। ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, রামমোহন তদানীন্তন কালের সমস্ত বিশেষত্বের, সমস্ত শক্তির রাজা ছিলেন। তিনি পার্থিব জগতের জড়পদার্থের রাজা

ছিলেন না, কিন্তু অজেয়, অদম্য, চিন্ময় শক্তিতে রাজা ছিলেন। এমন কোন শক্তি দেখি না, যাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব-মুখী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় উন্নতির যে কথা ভাবি, সে সকলেরই তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুসমাজের সতীদাহ নিবারণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন নিবারণ করিয়া রাজা যে কি অসীম, অজ্ঞেয়, অদম্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ভাবিলে অবাক্ হই। বুদ্ধি ও প্রতিভা, সাহস ও অধ্যবসায়, জ্ঞান ও প্রেম, ভক্তি ও কর্ম্ম—এ সকলের অনুশীলন করিয়া তিনি বঙ্গের এবং তৎসহ ভারতের ভাবী উন্নতির সকল উপায় উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন মানবপরিবারের উন্নতি এবং একতার উপায় নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি ভাষার উন্নতি এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সেই সময়ের অবস্থার কথা ভাবিলে চক্ষে জল পড়ে, উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গসমাজের তদানীন্তন কালের ধর্ম্মশিথিলতা স্মরণ করিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরস-ঘটিত কবিত্বের তখন কত আদর! ব্যভিচার, মদ্যপান তখনকার লোকের অলঙ্কার ছিল, ভাষা যেন বাঙ্গালীর রিপু সেবার সহচরী ছিল। বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবপূর্ণ লেখাও তখন আদিরস উদ্গীরণে সহায়তা করিত। আর ধর্ম্মহীনতার কথা কি বলিব—শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল লোক ব্যভিচার ও মদ্যপানে তখন মাতোয়ারা; ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি, পবিত্রতা—তখন কল্পনার জিনীস ছিল। শুনিয়াছি, তখন এমন লোক বিরল ছিল, যাহার অধীনে বেশ্যা থাকিত না, এবং এমন শিক্ষিত লোক পাওয়া যাইত না, যাহারা মদ্যপান করিত না। ঋষি-তুল্য রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত মদ্যপান করা নিন্দার জিনীস ছিল না।" রামমোহন এইরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পর হইতে যেন ধীরে ধীরে বাঙ্গালা দেশ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরশমণির সংস্পর্শে মাটী যেমন সোণা হয়, রামমোহনশক্তির সংস্পর্শে সেইরূপ, বঙ্গসমাজ ৫০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ যে সমাজের নানা বিভাগের এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলে তিনি। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি দেখিতেছি, ইহার মূলেও তিনি। বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত লেখার উপায় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিলেন; পদ্যময় বাঙ্গালা ভাষাকে উন্মুক্ত-ক্ষেত্র গদ্যে লইয়া আসিলেন। আর ধর্ম্মের কথা কি বলিব, আজ যে ভারতে এত

অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, ইহার মূলেও তিনি। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হও, সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, সকলেই তাঁহার উপাসনার অধিকারী, এ কথা এবং তৎসহ আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ, একথা তিনিই প্রচার করেন। জগতের ভাবী ধর্ম্মকে আবিষ্কার করা যেমন তেমন কাজ নয়। একেশ্বরবাদ যে জগতের ধর্ম্ম হইবে, কে তাহাতে সন্দেহ করিতে পারে? সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কার ব্যাপারে পথপ্রদর্শকরূপে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে,এ সকল যে আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা আমাদের ধারণা হইত কি না, সন্দেহ। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা আজও এমন মহাপুরুষকে প্রকৃত-রূপে জানিতে পারি নাই। তিনি ভাষা সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ তাঁহার একটু আদর করেন; তিনি রাজনীতি সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া কেহ আর একটু আদর করেন; তিনি সমাজসংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু আদর করেন। তিনি ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া আর কেহ একটু সম্মান করেন। কিন্তু ইহা কি তাঁহার প্রকৃত সম্মান? খ্রীষ্ট জীবন ঢালিয়া কোটি জীবনে আধিপত্য করিতেছেন; কই, রামমোহন রায় যাঁহাদের জন্য জীবন ঢালিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়জনের চরিত্রে তাঁহার শিক্ষা ও জীবনত্যাগের আধিপত্য আছে? খ্রীষ্ট একটী সত্য রক্ষার জন্য জীবন দিয়াছিলেন, আজ দেখিতেছি, খ্রীষ্টবিশ্বাসী কোটি কোটি লোক সত্য রক্ষার জন্য জীবন দিতে-ছেন। প্রকৃত সম্মান, প্রকৃত মহতের পূজা এইখানে। খ্রীষ্ট নরসেবায় মাতো-য়ারা ছিলেন, আজ দেখিতেছি, নরসেবার জন্য তাঁহার দলের লোক দেশ বিদেশে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। প্রকৃত মহত্বের সম্মান এই খানে। কত জানিত এবং অজানিত, কথিত এবং অকথিত, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসী লোক হিংস্র জন্তু সম অসভ্য জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, কে জানে? ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে জল পড়ে। আর মহাত্মা রামমোহন রায়, যিনি এদেশের জীবন সঞ্চারের জন্য জীবন দিলেন, তাঁহার প্রতিভা বা জ্ঞান, মহত্ত্ব বা চরিত্রের চিন্তা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক, তিনি যে সকল কাজে জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহার একটুও অনুকরণ বা অনুসরণ করি না। ধিক্ বাঙ্গালী জাতি, ধিক্ বাঙ্গালী চরিত্র।

আর ব্রাহ্মসমাজকেও ধিকার দি, ব্রাহ্মসমাজও এই মহাত্মার প্রকৃত সম্মান সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়

নাই বলিয়া এ কথা বলিতেছি না, তাঁহার উদার চরিত্র, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব, তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রম, তাঁহার দেশীয় এবং বিদেশীয় শাস্ত্রানুরাগ, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ তাঁহার নিরপেক্ষ ভাব ও স্বদেশ-সেবা—আমাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এ আক্ষেপ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে মহান্ ঈশ্বরের পূজা হয় সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় জাতিনির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে কই ব্রাহ্মসমাজ ভালবাসিতে পারেন? ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকত্ব, মতগত কুয়াসায় ডুবিয়া যাইতেছে কেন? তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য যেরূপ খাটিতেন, আমরা সেরূপ খাটিতে পারি কই? তিনি অসাধারণ অধ্যয়ন-পিপাসায় সকল জাতির শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া মানব পরিবারের উদ্ধারের জন্য, কি অমূল্য অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন! ঈশ্বর ও মানবাত্মার সাক্ষাৎ ভাবে যোগ,—গুরু নাই, মধ্যবর্ত্তী নাই, একথা তিনিই প্রচার করেন। বলেন যে, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মপূজার অধিকারী। সংসারে থাকিয়াও যে ধর্ম্ম সাধন হয়, নূতন ভাবে তিনিই ব্যক্ত করেন। মহাত্মা মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহার মতের উপর বর্ত্তমান ধর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এতদূর সম্মান করি যে, তাঁহার গ্রন্থরাশির পৃষ্ঠাও একবার উলটাইয়া দেখি না; তাঁহার উদার ধর্ম্ম মতের গভীরতা উপলব্ধি করি না! এমনই সম্মান-বোধ, এমনই অনুকরণ পিপাসা!! পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এতকাল পরে মহাত্মার নামে এক ক্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাপুরুষের মহত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সভার সভ্যগণকে, এজন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

কিন্তু যা হউক, তা হউক, একদিন এ দেশ এবং সকল দেশ তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বিধাতার কৃপা ললাটে ধারণ করিয়া একেশ্বরবাদ জগতের সকল স্থানকে জয় করিবার জন্য, দূর হইতে দূরান্তর ছুটিতেছে, নিমিষে নিমিষে সহস্র সহস্র নর নারীর মধ্যে এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করিতেছে। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল বিদ্বেষ ভাবকে পরাজয় করিয়া, এই ধর্ম্ম, আপন মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। দেখিতেছি, দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ইহা বিস্তৃত হইতেছে। বক্তৃতার ধর্ম্ম যখন বিশ্বাসে এবং বিশ্বাসের ধর্ম্ম যখন চরিত্রের প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মরণের কোল হইতে জাগ-

কর্ম্মযোগী ৺ভুদেব মুখোপাধ্যায়।

১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে, ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে যখন আমরা মহাত্মা ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলাম, তখন ভাবিতে পারি নাই যে, অল্প কাল পরেই ভূদেব বঙ্গদেশকে আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ মহা কর্ম্ম-যোগী ভূদেব অনন্তধামে আনন্দ-নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গদেশ অমূল্য রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিতেছে।

ভূদেব-জীবনী বিশ্লেষণ করিলে ইঁহাকে একজন অসাধারণ কর্ম্মযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জীবনী প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই; যখন বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে, তখন সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাল্যকালে পড়ার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; এমন কি, শুনা যায়,

পাঠে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ১৪ গ্রাসের অধিক ভাত খাইতেন না। পাঠের প্রতি এই প্রকার অনুরাগ তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। এরূপ অধ্যয়ন-পিপাসু ব্যক্তি সাধারণতঃ এদেশে প্রায় দেখা যায় না।

এদেশের অনেক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়াছেন। কিন্তু চাকরী করিয়া ভূদেবের ন্যায় উচ্চ সম্মান অতি অল্প লোকে পাইয়াছেন। কারণ আর কিছুই নহে, তিনি যে কাজ হাতে লইতেন, তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তাঁহার মাসিক বেতন ১৫০০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এদেশে শিক্ষিত, শিক্ষা-বিভাগের আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এত অধিক বেতন-প্রাপ্তি কখনও ঘটিবে কি না, জানি না।

ইহাও তাঁহার কাজের বহিরঙ্গ। তিনি স্বদেশ এবং মানব-পরিবারের উন্নতি সাধনের জন্য চিরকাল অম্লান চিত্তে খাটিয়াছেন। বাল্যে কবিবর মধুসূদন এবং নবাব আবদুল লতিফ তাঁহার সহিত এক সঙ্গে পড়িতেন। এক দিন তিন জনের ভাবী জীবন সম্বন্ধে পরস্পরের কথাবার্ত্তা হয়। মধুসূদন বলেন, "বায়রণের তুল্য কবি হইতে ইচ্ছা করি।" নবাব সাহেব বলেন "অত্যুচ্চ পদলাভ করা আমার ইচ্ছা।" ভূদেব বলেন—"দেশের কল্যাণ সাধনে আমার জীবন অতিবাহিত হয়, এই আমার অভিলাষ।" বালক ভূদেবের মনে কেমন স্বদেশ-প্রেম, বিদ্যালয়-জীবনের সময় হইতে অঙ্কুরিত হইতেছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাতৃভূমির উন্নতির কথা তিনি চিন্তা করিতেন এবং সে জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। অর্থ উপার্জ্জন, তাহাও স্বদেশের উন্নতির জন্য। এ পরিচয় সকলে পাইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী সকলের নিকট অবারিত-দ্বার ছিল, অবসর পাইলে কাহারও উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের কথা শেষ রোগ-শয্যাতেও যে ভুলেন নাই, দেড় লক্ষ টাকা দেশের উন্নতির জন্য দানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য অবস্থাপন্ন লোকের এরূপ দানের কথা, এদেশে, এই নূতন। আমরা ভূদেবের এই এক অসাধারণ কাজ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তিনি ভূদেবই ছিলেন। স্বার্থপরতা যে দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল, সে দেশে তিনি নিজ স্বার্থত্যাগের যে মহা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, এদেশ কখনও তাহা ভুলিবে না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান কত উচ্চ, ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে তাহা দেখাইয়াছি। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই বয়স পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পারিবারিক ও

সামাজিক প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য জিনীস। ইহা প্রতি জনের পাঠ করা উচিত; প্রতিগৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রাখা উচিত।

সর্ব্বোপরি, আমাদের অনুকরণের জন্য, ভূদেব, দীর্ঘকালব্যাপী একটী বিশুদ্ধ, আদর্শ, ধর্ম্ম-যোগময় জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। এরূপ সৎকর্ম্মশীল যোগী এবং সাধু এদেশে অতি বিরল। বঙ্গদেশ সৌভাগ্যশালী যে, এরূপ অমূল্য জীবন প্রসবে সক্ষম হইয়াছেন। বাঙ্গালীজাতি সৌভাগ্যশালী যে, তাহাদের মধ্যে এরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য ধন্য যে, এরূপ গভীর জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ইহার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা ধন্য যে, এরূপ আদর্শ মানব-চরিত সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। ভূদেব এদেশে চিরদিন ভূদেব রূপে পূজিত হইবেন।

৺ মহাত্মা কানাইলাল পাইন।

মহাত্মা কানাইলাল পাইন আর এ সংসারে নাই। ভক্ত, ভক্তিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া অনন্তধামে মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন জীবন্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তি ও বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের লোক হিন্দুসমাজে হীন পদবীতে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থামতে গুণানুসারী সম্মান প্রাপ্ত হইলে লোকের কত গুণ কেমন উপচীয়মান হয়, পরলোকগত এই মহাত্মার চরিত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য কথায়, অকপট ব্যবহারে, চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। এই মহাত্মাকে সেই চেষ্টার বিশিষ্ট ফল বলিতে হইবে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার সময়ে এমন কোন সৎকাজ অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল না। ধর্ম্মে তিনি প্রদীপ্ত ছিলেন, সত্যে ভূষিত, অনুরাগে প্রাচীন হইয়াও নবীন, কাজে বীরের ন্যায় সদা সতেজ ছিলেন। নব্যভারতে প্রকাশিত কোন একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, জীবনের শেষাংশে, তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা তাঁহার জলন্ত উৎসাহ দেখিয়া আবাক্ হইলাম, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলাম। তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আপনার মত পাঁচটী লোক পাইলে

আমি ব্রাহ্মসমাজে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারি”(I can work out miracles).” চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার বদনমণ্ডল উৎসাহে, বীরত্বে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বন্ধুবর ৺জগদীশ্বর বাবুর সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল, উভয় বন্ধু আজ স্বর্গে বসিয়া না জানি ব্রাহ্মসমাজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া কতই ব্যাকুল হইতেছেন। এই মহাত্মার স্বলিখিত অপ্রকাশিত জীবনকাহিনী হইতে নিম্নলিখিত মহামূল্য বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। এই মহাত্মা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না; যাঁহারা মনোযোগ সহকারে নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁহার ভক্তিকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার গভীর আত্মদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বিধাতার প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে, মহাত্মা কানাইলাল পাইন তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার পুণ্যবলে ব্রাহ্মসমাজ অনেক সৎকাজ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিকটবর্ত্তী কলুটোলায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺মধুসূদন পাইন। ৪ বৎসর বয়সে পিতৃ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়ায় শিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হয়। শীলদিগের কলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। ঐ কলেজ এখন শীলস্ ফ্রি-কলেজ নামে খ্যাত। ঊনবিংশ বৎসর বয়সেই একাউণ্টেণ্ট জেনেরেলের আফিসে চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর গৃহ-পাঠ ভিন্ন আর তাঁহার স্কুলে অধ্যয়ন হয় নাই। এই সময়ে একটী ১০ বৎসরের বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর * ঐ আফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের সহিত গাঢ় হৃদ্যতা জন্মে। এই মহাত্মার সহবাসেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে। তাঁহার উত্তেজনাতে ১৮৫৩ খ্রীঃ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে কানাই বাবু যোগ দেন। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ সমাজের প্রধান আচার্য্য হইলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কানাই বাবু সমাজের উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমাজের উপাসনা প্রণালী সংশোধনে ৺ মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার প্রধান সহায়

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন, পাথুরিয়াঘাটার স্বনাম-খ্যাত দেবেন্দ্র বাবু।

হন। অক্ষয় বাবু এই সময়ে সমাজের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হয়। কানাই বাবু এই সভার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে এই সভার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। তাহার পর দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এই কাজ পরিত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পরে এই সভা উঠিয়া যায়। এই সভার দ্বারা সেই সময়ে অনেক মঙ্গলদায়ক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কানাই বাবু এই সময়ে ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল চরিতমালা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া সভার বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করিতেন। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ চরিতমালা নামক পুস্তকে ছাপা হয়, অবশিষ্ট গুলি বামাবোধিনী পত্রিকায় ছাপাইতে দেওয়া হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ড্যাল সাহেব আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি অনেক বিষয়ে কানাই বাবুর সাহায্য করিতেন। ১৮৮৬খ্রীঃ মহাত্মা ড্যাল সাহেব কেশব বাবু এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড়ে গমন করিলে কানাইলাল বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের সহিত কানাই বাবুর পরিচয় হয়। এই সময়ে হিতৈষিণী সভার কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, লালবাজারে, নিবধই নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের ঔষধালয়ে একটী প্রার্থনা সমাজ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইহার কাজ চলে। কানাই বাবুর চেষ্টায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জন্য, এই সময়ে, তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মাসিক ২৫৲ সাহায্য প্রদানের বন্দোবস্ত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করায় তিনি মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইহার পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অক্ষয় বাবুর ইচ্ছানুসারে এই বৃত্তি বন্ধ হয়।

লালবাজারের প্রার্থনা সমাজ উঠিয়া গেলে,১৮৫৯ খ্রীঃ কানাইবাবু পঞ্চাননতলা হাড়কাটা গলির প্রাচীন আবাসে প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। কানাই বাবুর পত্নী এবং কোন কোন মহিলা ইহাতে যোগ দেন। ব্রাহ্মসমাজে মহিলার যোগদানের সূত্রপাত এই প্রথম। সুতরাং ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। প্রার্থনা সমাজ স্থানান্তরিত করিতে হইল। এই শেষোক্ত স্থানে ১৮৫৯ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সমাজের কাজ চলিয়াছিল। মহিলাগণ পর্দ্দার ভিতরে বসিতেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে কানাই বাবু অর্থ সাহায্য করেন এবং ইহার ডিরেক্টর পদ

গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এই স্কুলের শিক্ষকগণকে উপদেশ দিতেন এবং মহাত্মা কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত দুটী রজনী বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা দিতেন। কেশব বাবুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দানের পরই, তাঁহার বাটীতে, কলুটোলায় তিনি সঙ্গত-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানে অনেক মহাত্মার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ কানাইবাবুও ৬৭ নং পঞ্চাননতলা হাড়কাটায় এইরূপ আর একটী সভা গঠন করেন।

অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, এই সময়ে, কানাই বাবু ব্যবসা বাণিজ্য করিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতির আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে আফিসে ৪৫৲ বেতন পাইতেন। অনেক চেষ্টার পর ১৮৬২ খ্রীঃ ৬০৲ বেতন হয়। আফিসে ভাল কাজ করিয়াও কর্ম্মচারিগণের পক্ষপাতিতায় বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন। বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ৭৯।৶০ পেন্সন লইয়া মনঃক্ষোভে কাজ ছাড়েন। ১৮৬২ খ্রীঃ হইতে ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নানা সৎকাজে লিপ্ত ছিলেন এবং সোমপ্রকাশে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সত্যান্বেষণ পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন এডুকেসন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের নানা কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন, সে সকল ঘটনাপুঞ্জের বিশেষ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ণজীবনীতে এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে। এই সময়ে তিনি যেন কার্য্যস্রোতে ভাসিতেছিলেন। কখনও নূতন প্রার্থনালয় সংস্থাপন করিতেছেন, কখনও ডিবেটিং ক্লব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; কখনও পত্রিকা (সত্যান্বেষণ) লিখিতেছেন, কখনও রজনী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও নানাস্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং সমাজে উপাসনা করিতেছেন। পঞ্চাননতলায় বরাবর তাঁহার চেষ্টায় প্রার্থনা সমাজ চলিতেছিল। ১৮৬৫ খ্রীঃ কেশব বাবু আদি সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬৩ খ্রীঃ ৺ ঠাকুরদাস সেনের সহিত মিলিত হইয়া, কানাই বাবু, কেশব বাবুকে লইয়া বহুবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাসনা পদ্ধতি ঠিক করিয়া দেন। এই সমাজ হইতে সত্যান্বেষণ প্রকাশিত হয়। এই সমাজে বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য দুইটী শ্রেণী খোলা হয়। উচ্চশ্রেণীতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধর এবং নিম্ন

শ্রেণীতে কানাই বাবু শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে অনেক দিন কাজ চলিল না, ১৮৬৩ খ্রীঃ ইহার কাজ বন্ধ হইলে ৺ হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইল। এইখানেই প্রার্থনা সমাজ চলিতে লাগিল। ১৮৬৯ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমাজের সমস্ত দ্রব্যাদি ঐ সমাজে দান করা হয়। কানাই বাবু ইহার পরও কিছুদিন বাবু হরিমোহন পাইনের বাড়ীতে সমাজ করিতেন। সাম্বৎসরিক উৎসবে কেশব বাবু ও দেবেন্দ্র বাবু আসিতেন। তিনি ১৮৬৪ খ্রীঃ "A brief History of the Brahma Somaj" প্রকাশ করেন। ইহার পর পীড়া প্রযুক্ত অসমর্থ হওয়ায় প্রার্থনা সমাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর আর তিনি প্রকাশ্যে উপাসনা করিতে পারিতেন না।

সকলেই অবগত আছেন, কেশব বাবু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সংস্কারক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অধীনস্থ মদ্য-পান-নিবারিণী বিভাগের কার্য্যভার ৪ বৎসর কানাই বাবুর উপর ছিল। এই বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে বাবু নীলমণি ধর সম্পাদক হন, তৎপরে কানাই বাবু সম্পাদক হন। পীড়াপ্রযুক্ত শেষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের হস্তে ইহার ভার দিয়া কানাই বাবু অবসর লন। প্রতাপ বাবুর বিলাত গমনের পর এই পত্রিকা উঠিয়া যায়। তৎপরে সুরাপান সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের বাড়ীতে একটী ডিবেটীং ক্লব প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার মহোদয়ের অনুরোধে কানাই বাবু ইহাতে যোগ দেন। এখানেও তিনি বক্তৃতাদি করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ কেশব বাবু দেশে ফিরিয়া আসিলে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত থিসটিক্ সোসাইটির পুনর্গঠন করেন। কানাই বাবু এই সভার সভ্য হন এবং নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভা ৬ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ আদি-ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করেন, তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। কানাই বাবু ১৮৭৭ খ্রীঃ হিন্দু-এমুয়েটি ফণ্ডের ডিরেক্টর মনোনীত হন এবং এক বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত ঐ কাজ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ ফণ্ডের অডিটার মনোনীত হন। কিন্তু

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আপন জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। শেষ জীবন পীড়ার সেবাতেই অতিবাহিত হয়। এই সময়ে বাবু রসিকলাল পাইনের নিকট যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহা অতি সুন্দর ধর্ম্মভাবপূর্ণ। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য লাভের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করেন। বাল্যকালে রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পর আর করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার শরীর রোগে ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, এমন সময়ে আমাদের সহিত আলাপ হয়। এই সময়ে ভক্তিকথা লিপিবদ্ধ হয়। ইহা তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় দিবার জন্য জগতে রাখিয়া, ৬০ বৎসর বয়সে, ১২৯৮ সন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ইং ১২ই জুন, ১৮৯১ খ্রীঃ বেলা ৩ ঘটিকার সময় তিনি বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। যে বীর ব্রাহ্মসমাজের নানা সঙ্কটের অবস্থায় প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার নামও নাই। মহতের পূজা যে দেশে হয় না, সে দেশ মরণের কোলে চির-নিদ্রিত। যে সমাজে মহতের সম্মান নাই, সে সমাজ চির-মৃত। মহাত্মা কানাইলাল পাইনের কথা বঙ্গদেশ ও ব্রাহ্মসমাজ বিস্মৃত হইলে, এদেশ ও এই সমাজের মঙ্গল নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট কিছু ঋণী, ব্রাহ্মসমাজ নানাবিষয়ে বিশেষরূপ ঋণী। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩০০।

ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত।

যে মহাত্মা, বিগত ৯ বৎসর যাবৎ, বঙ্গের অদ্বিতীয় ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী, সুললিত ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পরম ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত, ২৫শে আষাঢ়, (১২৯৯) শুক্রবার, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্ম্মকাহিনী বিবৃত করাই যেন তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। চৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বে সমাধা হইয়াছে, এবার চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থ সমাধা করিয়া আর তাঁহাকে দীর্ঘকাল মর্ত্ত্য-

লীলা করিতে হইল না! এই সংসার অসার, জীবন মায়া বিশেষ। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে! ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শিথিল হয়। তাঁহার বিয়োগে ব্রাহ্মসমাজ একটি অমূল্য রত্ন, বৈষ্ণবসমাজ একজন প্রকৃত বন্ধু এবং সাহিত্যসমাজ একজন নিষ্ঠাবান্ সেবক হারাইলেন। জগদীশ্বর বাবুর মর্ত্ত্যলীলায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এরূপ প্রকৃত চরিত্রবান্ সাধু ভক্তের জীবন সাধারণের সম্পত্তি। জগদীশ্বর বাবুর পুণ্যময় জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু এই ভক্তের জীবনলীলা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ নহে,—সামান্যভাবে আরম্ভ, সামান্যভাবে সমাপ্ত। আমরা অতি সংক্ষেপে এস্থলে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিলাম।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে মেহেরপুর মাতুলাশ্রমে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত কুলীন-বৈদ্যবংশজাত ৺ গোপিকৃষ্ণ গুপ্ত ইঁহার পিতা, এবং মেহের-পুরের মল্লিককুল-জাতা রাধা সুন্দরী দেবী ইঁহার মাতা। জগদীশ্বর গুপ্তের সহিত শ্রীখণ্ড এবং মেহেরপুরের বিশেষ সম্বন্ধ। শ্রীখণ্ড, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শিষ্য শ্রীমৎ নরহরি সরকারের লীলাস্থল, সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্গ বিশেষ। মেহের-পুরের মল্লিক বংশ বৈষ্ণবধর্ম্মের চির উপাসক। পিতৃকুল শাক্ত, মাতৃকুল বৈষ্ণব, জগদীশ্বর বাবু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিশ্বাসের সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন। জগদীশ্বর বিশ্বাসভক্তির অনুপ্রাণনে মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন।

বাল্যকালে জগদীশ্বর ১১।১২ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৬৩ সালে কৃষ্ণনগর অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। ১৯বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে মহা বৈরাগ্যের সূত্র-পাত হয়। মাতাকে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া ভক্ত জগদীশ্বর নবজীবন লাভ করিলেন। ভক্তের স্ব-লিখিত কথা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মাবকাশে আমাদের কলেজ বন্ধ হইলে আমি কৃষ্ণনগর হইতে নপাড়া হইয়া শ্রীখণ্ডে মাতৃসদনে গেলাম। মা আমাকে লইয়া বড় সুখী হইলেন। আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালী তখন তিনি এক প্রকার গুছাইয়া লইয়াছেন, দরিদ্র হইলেও এখন তিনি স্বাধীন-ভাবে শাকান্ন খাইয়া সুখে আছেন। আমি অপরাহ্নে পৌঁছিলাম। আমার পাল্কী দ্বারদেশে আসি-লেই মা বাহিরে আসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লইয়া গেলেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া আমাকে খাইতে দিলেন। স্নেহময়ীর স্নেহ পাইয়া আমি সুখী হইলাম। কে জানিত যে সেই আনন্দই আমার জীবনের শেষ আনন্দ, কে জানিত যে সপ্তাহের মধ্যে মাতৃহীন হইয়া আমি সংসারবাজারে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইব?

তৃতীয় দিবস মাকে ওলাউঠা রোগ আক্রমণ করিল। মা ডাক্তারী ঔষধ খাইলেন না। আমি বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে ঘরে বিছানা করিয়া দিয়া একটু ঘুমাইতে বলিলাম। মা শুইলেন। হায়, সেই শয্যাই তাঁহার কাল-শয্যা হইল। মা মধ্যে মধ্যে দুই এক বার বাহ্যে যাইতে লাগিলেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে লোক কত কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু তখন আমার কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই। আমি খাইতে বসিলে মা আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। সেই বিষাদের ছবি, সেই স্নেহমূর্ত্তি যেন এখনও আমার চক্ষে চক্ষে রহিয়াছে। বেলা যতই অবসান হইতে লাগিল, মায়ের উপসর্গ ততই বাড়িতে লাগিল। ভীষণ জলপিপাসা ও বমন আরম্ভ হইল, প্রস্রাব বন্ধ হইল ও হাত পায়ে খিল ধরিতে লাগিল, ২।১ জন কবিরাজ আনাইয়া ঔষধ দেওয়া গেল, কোন উপকার হইল না। রাত্রিকালে কাটোয়ায় লোক পাঠান হইল না, কেননা ধন-সম্বল নাই। আমি বুঝিলাম, মা এ যাত্রা বাঁচিবেন না। মাও তাহাই বুঝিয়া আমাকে বিছানার কাছে ডাকিলেন ও অনেক কথা বলিলেন। আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ১২ই জ্যৈষ্ঠ শেষরাত্রে মাকে ডুলি করিয়া ইহ জন্মের মত গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রের ক্ষীণালোকে শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই ভীষণ গঙ্গাযাত্রার দল বাড়ী হইতে বাহির হইল। মা সেই যন্ত্রণার অবস্থাতেও গঙ্গাদর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটু পরেই দেখিলাম, মা ঘুমাইতেছেন, সে যে কাল নিদ্রার পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহা তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই। মায়ের জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় মা একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি চাহিয়া দেখিলাম, কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে। তখন সকলে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া সেই প্রেমের ছবি গঙ্গাগর্ভে লইয়া গেলেন। আমি মুখে গঙ্গাজল দিয়া সেই ভীষণ শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণ-বায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল। আমি সেই ভীষণ শ্মশানে মাতৃহীন হইয়া চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম। আর সেই সোণার প্রতিমা, মাতৃদেহ, আগুল্ফ-লম্বিত কেশদাম, সেই লাবণ্যময় গৌরবর্ণ,প্রবাল-বিনিন্দিত সেই দন্ত পংক্তি, সেই শোভনীয় সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে চিতাগ্নিতে ভস্মময় হইয়া গেল। সেই মূরতিমোহন কত দিন হইল ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও আমার অন্তরে উজ্জ্বলরূপে সেই চিত্র জাগিতেছে। সেই কমনীয় মাতৃমূর্ত্তিই আমার হৃদয়ের দেবতা, জীবনাকাশে আশা-নক্ষত্র। আমি যখনই ডাকি, চৈতন্যময়ী মা আমার আত্মার নিভৃত স্থলে আসিয়া কত সান্ত্বনা দেন, কত মধুর ভাবে আশ্বাসবাণী শুনান্। তাহা আর কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না। শ্মশানে মাতৃদেহ ভস্ম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ঘর বাড়ীর চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। এই দিন হইতে সংসারটা আমার নিকট যেন শূন্য হইয়া গেল।"

এইখানে ধর্ম্মের আরম্ভ,এইখানেই বৈরাগ্যের অভ্যুদয়। কৃষ্ণনগরে কলেজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি এণ্ট্রান্স, এল্-এ, বি-এ, বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার কলেজের অধ্যয়ন শেষ না হইতেই তাঁহার মাতুল বুঝিয়াছি-

লেন, ভাগিনেয় পৌত্তলিকধর্ম্ম রক্ষা করিবে না। কলেজে থাকার সময় এজন্য জগদীশ্বর বাবুকে অনেক সময়ে অনেক নির্যাতন ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল। একবার মাতুল-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা এবং এল-এ পরীক্ষায় তিনি ২৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন; নির্যাতনের সময় তাহা দ্বারাই চলিত। বি-এল পরীক্ষার পর কিছুদিন কৃষ্ণনগর, তারপর দিনাজপুরে ওকালতি করেন। যে রোগে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়াছে, দিনাজপুরে সেই যকৃত রোগের সূত্রপাত। দিনাজপুরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মেদিনীপুর গেলেন। সেখানে ৪ বৎসর ওকালতি করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল, তাহার উত্তেজনায় তিনি দীর্ঘকাল ওকালতি করিতে পারিলেন না। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেফী লইলেন। মেদিনীপুর, কাঁথি, বাঁকুড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থলে কয়েক বার অস্থায়ী মুন্সেফ হওয়ার পর, ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৲ বেতনে নেলফামারীর স্থায়ী মুন্সেফ হইলেন। ১৮৭৮খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর মাসে কাঁথির অস্থায়ী মুন্সেফ হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ১১ই জুলাই জাজপুর বদ্‌লি হন। ১৮৮২ খ্রীঃ ২৭এ ফেব্রুয়ারি কাটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হন। এই বৎসর ১লা জুলাই ২৫০৲ বেতনে উন্নীত হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ৬ই জুন যশোহরের অধীন বাগেরহাট বদলি হন। এইখানেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ। ১৮৮৭ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল ৩০০৲ বেতন হয়। ১৩ই এপ্রেল (১৮৮৭) কুষ্টিয়া বদলি হন, ১৮৯০খ্রীঃ ১লা অক্টোবর কুষ্টিয়া হইতে নোয়াখালি গমন করেন। ১৮৯১খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারি এক বৎসরের ফার্লো লইয়া কলিকাতা হইয়া দেশে যান, এবং সে স্থল হইতে বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিতে ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। কংগ্রেস দেখিতে তাঁহার বড় সাধ ছিল। এই যাত্রায় তাহা দেখিলেন, এবং বোম্বে, পুনা, দিল্লি, আগ্রা, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিলেন। এই ভ্রমণের কষ্টে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইল এবং শেষ পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে, ভক্ত প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বস্থানে বিধাতার নাম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। ভারতভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। কলিকাতায় আসার পর উপর্য্যুপরি ৬ বার যকৃতের বেদনায় ও জ্বরে কাতর হইলেন। এক বৎসরের পর পুনঃ দুই বারে ৬ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিধাতা শেষ বারের ছুটী তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে দিলেন না; পাছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন, এই জন্যই

বুঝিবা,ভক্ত ৮ই জুলাই (১৮৯২খ্রীঃ) ২৫শে আষাঢ় ১২৯৯, জীবনলীলা করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত জগদীশ্বর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, আজ সে সকল স্থানেই হাহাকার উঠিয়াছে। কলিকাতা, শ্রীখণ্ড, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালির বন্ধুগণ আজ কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। শ্রীখণ্ডের অসমাপ্ত স্কুলগৃহ আজ চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছে। কুষ্টিয়া-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ও স্কুলগৃহের ইষ্টকে ইষ্টকে জগদীশ্বর বাবুর নাম খোদিত রহিয়াছে। আজ তাঁহার পত্নী, বাল্যসহচরী, যৌবনের সহায়, কাঁদিয়া ধরা সিক্ত করিতেছেন, আর আমাদের দুঃখ কে বর্ণন করিতে সক্ষম? এত বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াও মহাযোগী আজ মহাশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন না। মহাবৈরাগ্যের মহামেলা—মহাচক্রীর মহালীলা!

ভক্ত জগদীশ্বর কি গুণে বন্ধুবর্গকে এত মোহিত করিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে আজ স্বীকার করিতেছেন যে, এরূপ সুলেখক বাঙ্গালায় দুর্লভ। প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবমাত্রের নিকট পরিচয় দিয়াছেন,তিনি চৈতন্যের প্রেমভিখারী মহাবৈষ্ণব ছিলেন। স্বদেশ এবং বিদেশের স্কুল প্রভৃতির কাজে মনোনিবেশ করিয়া বহুসময় দেখাইয়াছেন যে, তিনি স্বদেশভক্ত, স্বদেশপ্রেমিক মহাকর্ম্মী। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াও দীন ভিখারীর ন্যায় অর্থভিক্ষা করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার অমায়িকতা, নিরপেক্ষ ও নিরহঙ্কার ভাব, আব্দারময় সরল প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এরূপ প্রেমিক এই ভব-সংসারে বড় দুর্লভ। তিনি যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু এ সকল তাঁহার প্রকৃত মহত্ব নয়। তাঁহার প্রকৃত মহত্ব তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে। প্রকৃত ভক্ত সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে নিবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ভক্ত জগদীশ্বর নামে ব্রাহ্ম থাকিয়াও সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল দেশের জীবিত এবং মৃত সাধুভক্তের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সকল দেশের সকল শাস্ত্রের তিনি প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকায় এ দেশের শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সকল শ্রদ্ধেয় লোকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আদি, নববিধান, সাধারণ—

ব্রাহ্মসমাজের সকল লোক তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া গভীর শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন সকল সমাজের লোক উপাসনায় যোগ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি সকল দলের লোক ছিলেন। তিনি নামে গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ ধর্ম্মালোচনায় জীবন কাটাইতেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। গত বৎসর ভারতের অধিকাংশ স্থলে তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। অবশেষে,জীবনের অন্তিম অবস্থায়, বিডনপার্কে বক্তৃতা। নববর্ষ সমাগমে নববিধান সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু প্রসন্নচন্দ্র সেন মহাশয় বিডনপার্কে যে অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,বোধ হয় যেন, তাহা এই ভক্তের শেষ প্রচারের জন্য। দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর, ৫।৬ বার বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পার্কে স্বাধীনভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিবিহ্বলতা দেখিয়া সকলে উচ্ছ্বাসে "হরি হরি বোল" বলিয়া উঠিত। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। হ্যালি-লুজা নামক জয়গায়ক দলের সহিত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেন, সে এই ভক্তের শেষ জীবনের আর এক মধুর দৃশ্য। ধর্ম্মপ্রচার ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল, চৈতন্য-শাস্ত্রের পঙ্কোদ্ধার করা বিশেষ কাজ ছিল। যেরূপেই হউক, এই দুই কাজ যখন শেষ হইয়াছে, তখন আর ভক্ত থাকিবেন কেন? তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যলীলা, সংসার-মায়া পরিহার করিয়া মহাযোগে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, "বেশ আছি, জীবন ভালভাবেই কাটিতেছে।" যে দিন লীলামৃত লেখা শেষ হইল, সে দিন বিধাতাকে বিশেষরূপ পূজা অর্চ্চনা করিলেন,এবং প্রকারান্তরে বুঝাইলেন, তাঁহার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। মোহ মায়ান্ধ বন্ধুবর্গ আমরা তাহা বুঝিলাম না। উইল করিলেন, আমরা তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। ১৮ই আষাঢ় শুক্রবার বাড়ীতে সসম্মানে জয়গায়ক দলকে ডাকিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিলেন এবং তাহাতে মাতিলেন। এই দিনই জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হইল। তার পর কয়েকদিন রোগ শয্যায় অথবা মহাযোগে নিমগ্ন। কঠিন রোগ, বেদনায় অস্থির, তাহার মধ্যে মহাযোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন। দুটী হাত যোড় করিয়া বিধাতাকে ডাকিতেছেন। কে কবে, মর্ত্ত্যে এমন দৃশ্য দেখিয়াছ? কে কবে, আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া এইরূপ মহাযাত্রা করিতে পারিয়াছেন? হায় শ্রীখণ্ড আজ আঁধার! কলিকাতা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট—আজ সর্ব্বত্র বন্ধুগণ তাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু

সেই মহাযোগী, মহাবৈরাগী আর ফিরিলেন না! সেই উজ্জ্বলমূর্ত্তি, প্রশস্ত ললাট, সেই সদানন্দভাব, সেই নিরহঙ্কার প্রেম-গঠিত অমিয়-মাখা চেহারা আজ নিমতলার শ্মশানে নির্ব্বাপিত হইয়াছে! বিধাতার ভক্ত পৃথিবীর কার্য্য শেষ করিয়া আজ স্বর্গে বিহার করিতেছেন।

এরূপ সাধুজীবন দেশের গৌরব। ভক্ত জগদীশ্বরের পুণ্যময় জীবনে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। আর ব্রাহ্মসমাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে লইয়া কত উল্লসিত হইয়াছিলেন; আজ নীরবে কাঁদিতেছেন। ভবিষ্যতে এই ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস আরো কত যে বৃদ্ধি পাইবে, যে লীলামৃত গ্রন্থ পাঠ করিবে, সে-ই তাহা বুঝিবে।

হরিগুণ কথনে, হরিগুণ শ্রবণে, হরিকথা কীর্ত্তনে,—হরি-হিল্লোলে এই জীবন আরম্ভ; হরি-সেবায়, হরিমায়ায় এই জীবন শেষ। মহাবৈরাগী সাধু আজ অমরধামে ভক্তবৃন্দের সহ সম্মিলিত। স্বর্গে আজ আনন্দধ্বনি; আর মর্ত্ত্যে, এই আঁধার বঙ্গগৃহে আজ নিদারুণ বিলাপধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। বিধাতার ইচ্ছারই জয়।

নব্যভারত—শ্রাবণ, ১২৯৯।

ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ।

প্রকৃতির বহুরূপ। তন্মধ্যে দুই রূপ প্রধান,—স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও চেতন, অর্থাৎ বাহির ও ভিতর। সকল জিনিসের কতকটা স্থূল, কতকটা সূক্ষ্ম, অথবা কতকটা জড়, কতকটা চেতন। স্থূল বা জড়বোধ সকলেরই ভাগ্যে অল্পাধিক পরিমাণে ঘটে, কিন্তু সূক্ষ্মত্ব-বোধ বা চেতন-বোধ অল্প লোকেরই হয়। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এমারসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ স্থির করিয়াছেন, জড় আর কিছুই নহে, চেতনশক্তির পুঞ্জীকৃত অবয়ব মাত্র, অথবা ঘনীভূত, জমাট শক্তির তরঙ্গ মাত্র। জড় ও চেতনের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম যে নিত্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এ কথা কেহই বড় একটা অস্বীকার করেন নাই। সকল বস্তুরই দুইটা দিক্, একটা স্থূল, একটা সূক্ষ্ম,—অথবা একটা বাহির, একটা ভিতর। মানুষের শরীর ও আত্মা, এ কথার জীবন্ত প্রমাণ স্থল। স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম আত্মা বাস করেন। একটা অনুভূত, অন্যটী সাধারণতঃ অননুভূত। একটার আদর অধিক, আর

একটা সাধারণতঃ অনাদৃত। শরীরের সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, আত্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ অতি অল্প লোক। স্থূলরূপের সৌন্দর্য্যে জগতের নরনারী আত্মহারা, সূক্ষ্ম রূপে কিন্তু মানুষ সেরূপ নয়। মানুষ প্রকৃতির অসার বাহির লইয়াই সংসার করে, ঘর বাঁধে,—অন্তর, ভিতর, সার লইয়া মজে অতি অল্প লোক।

মানুষ সাধারণতঃ স্থূলে মজে, সুতরাং মানবের সমষ্টি সমাজও স্থূল লইয়া আইন কানুন করেন। ধর্ম্মনীতি এবং সমাজ—সাধারণতঃ মানুষের স্থূল-জ্ঞানের স্থূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্মাংশ বুঝিতে, ধারণ করিতে, অবলম্বন করিতে চায় অতি অল্প লোক;—পারে আরো অল্প লোক। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি।

ধর্ম্মের স্থূল ভিত্তি কি? মত, পূজা, উপাসনা, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম্ম। ইহার দৃষ্টান্ত সকল সম্প্রদায়ে পাওয়া যায়, ইহার নাম সামাজিক ধর্ম্ম। সূক্ষ্ম ভিত্তি কি?—বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, সেবা, চরিত্র ও জীবন। ইহার দৃষ্টান্ত সাধু ও মহাপুরুষগণের জীবন। নীতির স্থূল ভিত্তি কি? অনুশাসন ও দণ্ড; অর্থাৎ এটা কর, ওটা করিও না; এটা অবলম্বনের জিনিস, ওটা নহে, এইরূপ আদেশ। ইহার দৃষ্টান্ত,—বিধি ব্যবস্থা, লৌকিক ধর্ম্মজ্ঞান। নীতির সূক্ষ্ম ভিত্তি কি? অনুজ্ঞান, অনুপ্রাণন, আদেশ। ইহার দৃষ্টান্ত বুঝান একটু কঠিন।

"মিথ্যা কথা বলা অন্যায়"—ইহা একটী নীতির সাধারণ জ্ঞান। ইহা মহাপুরুষ-প্রচারিত, শাস্ত্রানুমোদিত কথা, ইহা নীতির স্থূল ভিত্তি। সূক্ষ্ম ভিত্তি, এই কথার সারত্বের অনুজ্ঞান। অর্থাৎ লোকের কথায় ইহা বিশ্বাস করা এক কথা, এবং বিধাতার অনুপ্রাণনে, আদেশে বা অনুজ্ঞানে ইহা বিশ্বাস করা আর এক কথা। অথবা ইহা কণ্ঠস্থ করা, এক কথা এবং ইহা অনুসরণ করা আর এক কথা।

সমাজের স্থূল ভিত্তি আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, নিয়ম প্রণালী। সূক্ষ্ম ভিত্তি—আত্মীয়তা, ভালবাসা, পরোপকার, লোকহিতব্রত, একতা। ইহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে।

এখন বুঝাইতে কষ্ট হইবে না যে, মনুষ্য স্থূল লইয়া সদা ব্যতিব্যস্ত। ধর্ম্মমত, নীতির অনুশাসন, সমাজের নিয়ম প্রণালীর পক্ষপাতী জগতের বার আনা লোক। ভিতরের সার বস্তুর অন্বেষণ করে, অতি অল্প লোক।

তিনটী বিষয়কে আমরা পৃথক্ করিয়া দেখাইলাম, কিন্তু ইহা তিন নহে, ধরিতে গেলে একই। তিনে এমনি দুশ্ছেদ্য বন্ধন, এক হইতে অপরকে

পৃথক্ করা কঠিন। একে তিন, তিনে এক। এক মহান্ ঈশ্বরের তিন প্রকাশ, অথবা এই তিন মিলিয়া বিধাতৃত্ব। আমরা এই তিনে এক, একে তিন অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একটী পৌরাণিক গল্প আছে। এই গল্পটী আমাদের বক্তব্যের অনুকূল। প্রথমতঃ এই গল্পটী বিবৃত করিতেছি।

এক স্থানে একজন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী এবং তাহার নিকটে একজন বারনারী বাস করিত। সন্ন্যাসী নিষ্ঠাবান্, গায়ে গৈরিক ও কপালে তিলক পরিতেন, অঙ্গ বিভূতি দ্বারা ভূষিত করিতেন,এবং ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কথা,এবং সাংসারিকতার নিন্দা উচ্চারিত হইত। যাহারা ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান করে না,সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। নিকটে যে বেশ্যা বাস করিত, তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, সর্ব্বদাই তাহার নিন্দা করিতেন,পশুর জীবনের সহিত তাহার জীবনের তুলনা করিতেন। জাতিভেদ না মানিয়াও, ভেদ-বোধ-রূপ গরল পানে সদা তিনি বিভোর থাকিতেন। পাপী পুণ্যাত্মার ভেদ, তাঁহার অন্তর বাহির গ্রাস করিয়াছিল। যখন তখন বলিতেন,পাপীর সংস্পর্শে এবং তাহাদের সহিত আহারে বিহারে ধর্ম্মলোপ পায়। আত্মাভিমানে সদা তিনি স্ফীত ছিলেন।

আর ঐ অস্পৃশ্যা, সর্ব্বজন-নিন্দিতা, কলুষিতা বেশ্যা, আপন অবস্থায় সদা ম্রিয়মাণা থাকিত। নিজ অবস্থায় একদিনও সুখী ছিল না। অবস্থার পীড়নে বাধ্য হইয়া যে জঘন্য কাজ করিত, তজ্জন্য অনুতাপে সদা হৃদয় মন অবসন্ন থাকিত। বাধ্য হইয়া, বেশ-ভূষার পারিপাট্য করিতে হইত, কিন্তু সেজন্যও মনে ক্লেশ হইত। বাহিরে বাহিরের অনুষ্ঠান, অন্তরে অনুতাপ, আত্মগ্লানি, ধর্ম্মে ঐকান্তিক মতি, হরির প্রতি গভীর ভক্তি ছিল, কিন্তু পৃথিবীর কেহ তাহা জানিত না। সংসারে যেরূপ সচাচর হইয়া থাকে, সকল লোকই তাহাকে ঘৃণা করিত। ঐ সাধু সন্ন্যাসীও ঘৃণা করিত।

ঘটনাচক্রে যথাসময়ে উভয়ের মৃত্যু হইলে, সাধু সন্ন্যাসীর মৃতদেহ ফুল চন্দনে সজ্জিত করিয়া বহুলোক শেষ সম্মান রক্ষা করিল; আর ঐ বেশ্যার কেহ নাই—মৃতের সঙ্গী ডোমেরা প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া শব টানিয়া শৃগাল কুকুরের ভক্ষণের জন্য ফেলিয়া দিল। মৃত্যুর পর উভয় আত্মার গতি কি হইল? সন্ন্যাসীর আত্মার নরকের দিকে গতি হইতে লাগিল, আর ঐ বেশ্যার আত্মার গতি স্বর্গের দিকে। সন্ন্যাসী বিধাতার এইরূপ অবিচার দেখিয়া

ক্রোধে,ক্ষোভে,দুঃখে অভিভূত হইলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই স্থলে উপস্থিত। সন্ন্যাসী ক্রোধভরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ-পতির এ কি বিচার? আমি কত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছি, আমার নরকে গতি হইতেছে, আর ঐ বেশ্যা আজীবন অধর্ম্মের কাজ করিয়াছে, উহার স্বর্গে গতি হইতেছে? বিধাতার এ কি লীলা?" দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "বিধাতার লীলা কে বুঝিবে! তাঁহার বিচার ঠিক হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অনেক করিয়াছ, সত্য; বৈরাগ্যের কঠোর শাসনে শরীরকে পবিত্র রাখিয়াছ, তাহাও সত্য। তোমার শরীরকে পবিত্র রাখার ফল তুমি হাতে হাতে পাইয়াছ। পৃথিবীর লোকেরা তোমার পূজা করিয়াছে, অসংখ্য শিষ্য তোমাকে দেবজ্ঞানে মান্য করিয়াছে, এবং শেষে, মৃত্যুর পর, তোমার পবিত্র শরীরকে পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অহঙ্কার ছিল যে, তুমি বড় ধার্ম্মিক। এজন্য তুমি পৃথিবীর সকল লোকের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে। আত্মা যার বিনীত নয়, ধর্ম্মে তার অধিকার জন্মে নাই। বাহিরের সাধন করিয়া বাহিরের পুরস্কার পাইয়াছ, এখন অন্ত-রের সাধনের জন্য কিছুদিন নরকবাসী হও। যখন বুঝিবে, তুমি কিছুই নও, তোমার মান অভিমান যখন ভুলিতে পারিবে, যখন যশ নিন্দা ভুলিবে, তখন স্বর্গে তোমার অভ্যুত্থান হইবে। আর ঐ বেশ্যা শরীরকে অপবিত্র করিয়াছিল, শরীর ব্যাধিতে পচিয়াছে, তারপর ডোমেরা রাস্তায় টানিয়া ফেলিয়াছে, শৃগাল শকুনী শরীরের শেষ সম্মান রক্ষা করিয়াছে! ঐ বেশ্যার আত্মা সদা অনুতপ্ত ছিল, বহু লোকের ন্যায়, পাপ করিয়া অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করে নাই, তাহার অভিমান ছিল না, আপনার অস্তিত্বে সে এক দিনও সুখী ছিল না। কখনও কাহারও নিন্দা করিত না—কখনও আপনাকে বড় মনে করিত না। সদা হরির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত এবং নীরবে বলিত—"হরি, কবে আমার এ দশা ঘুচিবে?" হরি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও অনুতাপ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এজন্য স্বর্গে তাহার আত্মার গতি হইতেছে। অহঙ্কার জীবের সর্ব্বনাশের মূল। অহঙ্কার পাপীরও সর্ব্বনাশ করে, পুণ্যাত্মারও করে।" সন্ন্যাসী দেবর্ষি নারদের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

আর একটী গল্পের কথা উল্লেখ করিতেছি। কোন স্থানে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পতিপরায়ণা, সাধ্বী, দশকর্ম্মান্বিতা, পুণ্যশীলা, কিন্তু অহংবোধে একটু আত্মহারা। তিনি সদা পূজা অর্চ্চনায় দিন কাটা-

ইতেন। স্বামী কিন্তু মুখে ধর্ম্মের কোন কথাই বলিতেন না, কোন প্রকার পূজা অর্চ্চনা করিতেন না, কোন প্রকার বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন না, তিনি বিনয়ী, দীন কাঙ্গালের ন্যায় থাকিতেন। ঈশ্বরের, কি ইষ্টদেবতার নামও কখন মুখে উচ্চারণ করিতেন না। এজন্য তাহার স্ত্রী বড়ই কষ্ট পাইতেন, ভাবিতেন, আমার স্বামী একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের নাম মুখে আনেন না; কি দুঃখের কথা! এ দুঃখ কিন্তু স্বামী জানিতেন না। স্বামী সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। হঠাৎ এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া স্বামী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী, স্বামীর মুখে, রাত্রিতে ঈশ্বরের নাম শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন, বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, এবং পর দিন পূজা অর্চ্চনার বিশেষ আয়োজন করিলেন। স্বামী এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া পূজার বিশেষ আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে আজ বিশেষরূপ আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ সকলের কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শেষে ভার্য্যাকে আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভার্য্যা প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "এত দিন তোমার মুখে ইষ্টদেবতার নাম না শুনিয়া আমি মর্ম্মে মরিয়াছিলাম; তুমি ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান কর না দেখিয়া মনে ভাবিতাম, তুমি নাস্তিক। এ জন্য কত অশ্রুপাত করিয়াছি, কত কষ্ট সহিয়াছি, বিধাতাই জানেন। কাল রাত্রে, আমার পরম সৌভাগ্যে, তোমার মুখ হইতে ঈশ্বরের নাম বাহির হইয়াছিল, সে জন্য আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই সব আয়োজন।"

এই কথা স্বামীর মনে শেল সম বিদ্ধ হইল, ইষ্টদেবতার নাম আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অন্তরের জিনীসকে অন্তরে রাখিতে পারিলাম না, এই কষ্ট দারুণ আঘাত করিল। শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি হঠাৎ সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, এই পতনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। স্ত্রী, স্বামীর গভীর অন্তরমুখী ধর্ম্মভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন, আপনার জীবনকে ধিক্কার দিয়া, অনুতাপে, পতির অনুসরণ করিলেন। গ্রামের সকল লোক জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

যে দুটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে, মানুষের বাহিরের আচার ব্যবহার ধর্ম্মভাব-জড়িত হইলেও, অন্তর পরিশুদ্ধ না হইতে পারে; দ্বিতীয় কথা, বাহিরে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও, ভিতরে একজনের ধর্ম্মগত জীবন থাকিতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, ধর্ম্ম বাহিরে দেখানের জিনীস

নয়, ইহা যত সংযতভাবে অন্তরে থাকে, ততই মঙ্গল এবং তাহাতে অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষের বিমল চরিত্রে ধর্ম্মের কোনরূপ বহিপ্র্রকাশ হয়, হউক, আপত্তি নাই, কিন্তু চরিত্র ভিন্ন আর যে প্রকার বহিপ্র্রকাশ হয়, তাহাই মারাত্মক, তাহাতেই অহঙ্কার প্রসব করে। ভক্ত, যোগী, সাধু এ সকলেরও অহঙ্কার সাধনপথের বিঘ্ন ঘটায়—স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করে। পাপীর ত কথাই নাই, অন্তরে পাপ করিয়া যাহারা বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া অহঙ্কারে মত্ত থাকে, তাহাদের ত কথাই নাই। ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি অন্তরে পড়িলে মুখে তার ছবি প্রতিভাত হয়, একথা অস্বীকার করি না। প্রকৃত ধার্ম্মিক পাপী তাপীর জন্য জীবন বলি দিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। পাপী মানব, ধর্ম্মের আদর্শে জীবন গঠনে যখন সমর্থ হয়, তখন বিনয়ে তাঁহার মূর্ত্তি নমিত হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, পাপীদিগের প্রতি। পাপীদিগের প্রতি সহানুভূতি, তাহাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা, প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ। প্রকৃত ধার্ম্মিক এইখানে মানবের নিকট ধরা পড়েন। ইহাতে দোষ নাই। জেনেরেল বুথ, মুর প্রভৃতি মহাজন এইখানে ধরা পড়িয়াছেন; ঈশা, মহম্মদ, গৌর, নিতাই এই প্রেমে বাঁধা। নচেৎ তাঁহারা কি ধর্ম্ম সাধন করেন বা করিতেন, মানুষ তাহা জানে না। ইহারা তৃণের ন্যায় দীন, বৃক্ষের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা—এ ভেদ রাখেন না। তাঁহারা মানবের জন্য কাঁদিয়া আকুল। কিসে মানুষের কল্যাণ হইবে, দিবানিশি কেবল এই ভাবনা। আর যাঁহারা মতের দাস, অনুষ্ঠানের দাস—বাহ্যব্যাপারে মত্ত,—জ্ঞান ভক্তিতেও তাঁহাদের অহঙ্কার। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় জীব এই পৃথিবীতে আর নাই। ভেদ-বুদ্ধি তাঁহাদের অন্তর বাহিরকে জর্জ্জরিত করিয়া সর্ব্বনাশ করে—জাতিভেদ না মানিয়াও তাঁহারা নবনব জাতিভেদ-কৌশল সৃষ্টি করেন। হিন্দুসমাজ মত ও অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব বাহ্য জ্ঞান লইয়া ডুবিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ ও ক্রমে ক্রমে সেইদিকে ঝুঁকিতেছে। নানা ঘটনায় দেখিতেছি, ভূতলশায়ী জাতিভেদ-বৃক্ষের নব নব অঙ্কুর এই সমাজের ভিতরে পুনঃ গজাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছেন যে, ভিতরের ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ জাতিভেদের পোষকতায় এখন মনোনিবেশ করিতেছেন। নীচ বর্ণে আদান প্রদান করিতে, এখন দিন দিন দেখিতেছি, অনেকেরই অনিচ্ছা হইতেছে। হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ বর্ণগত, সেই বর্ণগত জাতিভেদ, চরিত্র, ধন,

বিদ্যার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এখন ব্রহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে। অনেক মহারথী ইহা বুঝিতেছেন, কিন্তু কেহই এই বিষ-বৃক্ষ বিনাশে বদ্ধপরিকর নহেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ যেন কিছু মত ও অনুষ্ঠানের দাস হইয়া পড়িতেছেন। অন্তরমুখী ধর্ম্মভাব ক্রমেই যেন হ্রাস হইতেছে। বিবাহ-প্রথা-সংস্কারে এবং জাতিভেদ-প্রথা-উন্মূলনে সমাজে ধর্ম্মাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই প্রথা-প্রস্তরের চড়ায় ঠেকিয়া বহু ধর্ম্মজাহাজ বহু সমাজ-সমুদ্রে বান্‌চাল হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-প্রথা সংস্কার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কতকদূর অগ্রসর হইয়া এখন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা এখন ব্রাহ্মসমাজকে যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকেই গতি হইবে। দ্বিতীয় কথা, জাতিভেদ-নাশ বাহিরে কতক হইয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ পৈতা ফেলিয়াছেন, জানি, কিন্তু অহঙ্কারের উত্তেজনায় এখন পুত্রকন্যার বিবাহের সময়, দেখিতেছি, অনেকেই আভিজাত্য ভাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছেন। ভয় হইতেছে, বুঝি বা শেষে জাতিনাশ, ব্রাহ্মসমাজে, আহার-গত হইয়া দাঁড়ায়। একজন খ্রীষ্ট-মহিলা কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পাপীদের জন্য, তোমরা ব্রাহ্ম, পুণ্যাত্মাদের জন্য!" বাস্তবিক যেন কথাটা কাজে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ-নাশ, কেবল আহারের সময়, করিলে হয় না। পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা, অন্য বর্ণের প্রতি ঘৃণা, অন্য সমাজের লোকদিগের প্রতি ঘৃণা, ব্রাহ্মসমাজে বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। পাপী উদ্ধারের জন্য এখন ব্রাহ্মসমাজ বড় একটা চেষ্টা করিতেছেন না। দ্বারে পাপী ও পতিত জন উপস্থিত হইলেও, ব্রাহ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষা করেন। পাপের প্রতি ঘৃণা থাকা মঙ্গলের কথা, কিন্তু পাপীর প্রতি নহে। পাপীর প্রতি জীবন্ত ঘৃণা-বোধ ব্রাহ্মসমাজে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে অহঙ্কারের ফল, সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ-ধর্ম্ম-সাধন হীন হইলেই অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান গিয়াছে। এখন কে সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ অন্তরঙ্গ-ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধ হইতেছেন? হিন্দুসমাজের বহু লোক দশকর্ম্মান্বিত,—পূজা অর্চ্চনা করে, গৈরিক, নামাবলী, তিলক ধারণ করে, কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ব্যভিচার, মদ্যপান, চৌর্য্য, বিবাদ বিসম্বাদ এ সকলে লিপ্ত হইতে বড় একটা কাতর হয় না। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য না পারে এমন কাজ নাই। বড় বড় নেতারা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না, অন্য সম্বন্ধে আর কথা কি? হিন্দুসমাজে আজকাল ধর্ম্মের নামে না চলে, এমন কাজ নাই।

যার যা ইচ্ছা—করিতেছে, অথচ তাহারাই সমাজের নেতা। আর ব্রাহ্মসমাজ, ভারতের আশা ভরসার সমাজ;—এখানে কি দেখি? এখানে উপাসনা আছে, উৎসবাদি আছে, অনুষ্ঠানাদি সবই আছে, কিন্তু দিন দিন জাতিভেদ আবার জাগিতেছে, পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস হইতেছে, পাপীর প্রতি ঘৃণা বাড়িতেছে, বিবাহাদিতে নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে, আর ঘরে ঘরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে বিবাদ বিসম্বাদ দিন দিন আরো সজীব হইয়া উঠিতেছে। এই সকল দেখিয়া একদিন একজন প্রবীণ ব্রাহ্মসাধু বলিয়াছিলেন, বহির্মুখী সাধনার পরিণাম যাহা, তাহাই ব্রাহ্মসমাজে হইতেছে। বহির্মুখী সাধনায় যাহা মত, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা বিশ্বাস; বহির্মুখী সাধনায় যাহা ভাব, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা ভক্তি; বহির্মুখী সাধনায় যাহা অনুষ্ঠান, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা অনুরাগ; বহির্মুখী সাধনায় যাহা পূজা, অন্তর্মুখী সাধনায় তাহা সম্ভোগ; বহির্মুখী সাধনায় যাহা মত্ততা, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা সমাধি; বহির্মুখী সাধনায় যাহা কল্পনা, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; বহির্মুখী সাধনায় যাহা বক্তৃতা, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা সেবা। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, একটী কত সহজ, অন্যটী কত কঠিন। গুরুমুখে মন্ত্র শুনিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা ও মত বিশেষ ধরিয়া থাকা সহজ, অতি সহজ। অনুষ্ঠানাদি করা ও ধর্ম্মের পোষাক পরিধান করা আরো সহজ। কিন্তু প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-সিদ্ধ বিধাতার অনুপ্রাণনে বিশ্বাসের উদয় হওয়া ও তাহা ধারণ করা অতি কঠিন। ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা শক্তিসঞ্চার করাইয়া ধেই ধেই করিয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করা সোজা কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ মাতৃ-দর্শন-জনিত অলৌকিক বিহ্বল-চিত্তের তন্ময়ত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। জটা রাখিয়া, বিভূতি মাখিয়া, গৈরিক ও নামাবলী পরিধানপূর্ব্বক ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া খুব সোজা, কিন্তু অন্তরে প্রেমবিহ্বল চিত্তের নির্ভরশীলতা ও বিমল-চরিত্র লাভ করা অতি কঠিন। উদ্দাম নৃত্য কে না করিতে পারে? কিন্তু আত্ম-হারা ভাবে তাঁহাতে মজিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারে কয় জন? ধর্ম্মের নামে বক্তৃতা করিতে সকলেই পারে, কিন্তু নর-সেবা দ্বারা শরীর মনকে পবিত্র করিতে পারে কয় জন? বাহিরের সাধনায় জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে পরিত্রাণের একটুও উপকার হয় না। আমরা যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, ভিতর-সার-শূন্য বাহ্যানুষ্ঠান নরকের পথ প্রস্তুত করে। বাহিরের সাধনায় অহঙ্কার জন্মে—অহংজ্ঞানটা সর্ব্বময় হয়; অন্ত-

রের সাধনায় বিনয় জাগিয়া উঠে, আত্মনাশ-বোধ জন্মে। আমি কিছুই নই, কেবল তিনি, এই বোধ না হইলে ধর্ম্ম রাজ্যের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। বাহিরের কাজ ধরিয়া বাহিরেই মানুষ মজিতে পারে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল মৎস্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারা গভীর জলে ডুবিতে পারে না। যাহারা গভীর জলে ডুবিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইতে চায় না—গভীর শান্তি এবং শীতলতায় তাহারা নিমগ্ন; উপরের তরঙ্গের উত্তেজনায় তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। সেইরূপ, যাহারা সংসারে ভাসিয়া বেড়ায়, যশোনিন্দার তরঙ্গে তাহারাই আন্দোলিত হয়,—লোকেরপ্রশংসায় তাহারা নাচে, লোকের নিন্দায় বসিয়া পড়ে—অথবা তাহাদের সকল অনুষ্ঠান লোকের প্রবর্ত্তনায় অঙ্কুরিত। আর যাঁহারা সংসারের সার বিধাতার গভীরতম ক্রোড়ে নিমগ্ন, বাহিরের যশো-নিন্দার বাহ্য তরঙ্গে তাঁহাদের কিছু করিতে পারে না, তাঁহারা চির শান্তিতে, চির পবিত্রতাতে সংসারের ঝড় তুফানের অতীত হইয়া বাস করেন। উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিলে নিম্ন প্রান্তরের সব যেমন সমান দেখা যায়, তাঁহাদের আত্মার নিকট, তেমনই সব, বড় ছোট, সমান হইয়া যায়। গভীর রাজ্যে—সমত্ব, সাম্য, একত্ব, মিলন। পৃথক্ পৃথক্ বোধ, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব-বোধ, বিচ্ছেদ—সংসারজ্ঞানের কথা। সংসারের অতীত কথা—একের অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব,—একে সব স্থিত। সুতরাং সেখানে অনন্তত্ব আছে বটে, কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। ভেদ-বোধ বা বৈচিত্র্য-বোধ—সংসারের কথা। সম্প্রদায়, সংসার-ধর্ম্মে সম্ভব। কিন্তু সংসারের অতীত মাতৃধর্ম্মে সমতা, একতা, চির-মিলন। পৃথিবীতে বহু নদ নদী আছে, কিন্তু সে সকল যখন সাগরে সম্মিলিত হয়, তখন সব একাকার। কোন্ নদী বড়, কোন্ নদী ছোট, —কোন্‌টী কৃষ্ণা, কোন্‌টী কাবেরী—এ বিচার করে সাধ্য কার?—সব একাকার হইয়া গিয়াছে। রেখা-বোধ, সীমা-বোধ, ক্ষুদ্রত্ব-বোধ,—সকল ভেদ-বোধ সংসারের কথা; ধর্ম্মের কথা—অনন্তত্ব ও ভেদাভেদ-রহিতত্ব-বোধ। তুমি মাটীর নশ্বর দেহ পুষ্পচন্দনে সজ্জিত করিয়া ভাবিতেছ, তুমি বড় ধনী, বড় ধার্ম্মিক, বড় বিদ্বান্? হায়, হায়, হায়, তুমি জান না, শ্মাশানে তোমার এই শরীরের পরিণাম কাঠ-লেখনী অগ্নি-কালীতে কিরূপ লিখিবে!! তোমার শরীরের পরিণাম ঐ চিতার ভস্ম! যে ভস্মে দীন দরিদ্র, পাপী তাপীর পরিণাম, ঐ সামান্য, উপেক্ষিত— চিতার ভস্ম! কিসের অহঙ্কার তোমার ভাই? তুমি বৈচিত্র্যই দেখিতেছ, বৈচিত্র্যই গণিতেছ। শ্মাশানে যাইয়াও তোমার সমত্ব

জ্ঞান জন্মিতেছে না! কি আর বলিব! দেখ মৃত্যুর পর ঐ অহঙ্কার-বর্জ্জিত অনুতপ্ত বেশ্যার গতি কোথায়,আর সাধু সন্ন্যাসীর গতি কোথায়? অন্তরে প্রবেশ করিয়া,তুমি কি, তাহার অন্বেষণ কর,ভিতরে যাহাতে সৎ হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর। আত্মার মূলে অবগাহন না করিলে কেহই কাশী,বৃন্দাবন, গয়া, মক্কা বা জেরুজালমে যাইয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে না। আত্মার মূলে যাইয়া বাসনার আগুন নিবাইতে না পারিলে, কেহই যাগ যজ্ঞ বাহ্য অনুষ্ঠানের আগুন জ্বালিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। আত্মার মূলে ডুবিলে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মাকে চিনিতে পারে। পরমাত্মা—আত্মার মূলে। তুমি গয়া কাশী বেড়াইলে, শত শত অরণ্য পর্ব্বত ঘুরিয়া মরিলে, কত সাধু সঙ্গ করিলে, অবিচারিত ভাবে কত গুরুর উপদেশ পালন করিলে, কত বাহ্য অনুষ্ঠান ক্রিয়া কাণ্ড করিলে, কত পুস্তক পড়িলে, কিন্তু একবারও আত্মার মূলে অবগাহন করিলে না! ধিক্ তোমাকে! চিনিলে না তুমি কে,বুঝিলে না—তোমার পরিণাম কি? পাপরাশিকে দিন রাত্রি অমৃতের ন্যায় পান করিয়া বিভোর হইয়া রহিলে এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্যের সামান্য অপরাধকে গুরুতর মনে ধারণা পূর্ব্বক ঘৃণা করিলে, কেবল পরনিন্দা কণ্ঠের ভূষণ করিয়া রহিলে; আপনাকে চিনিতে পারিলে, কথনও এরূপ করিতে না। আপনি কত পাপ করিয়াছ, সে জ্ঞান থাকিলে, অন্যকে ঘৃণা করিতে,পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইত না। যে নিজে মরিয়া রহিয়াছে, সে অন্যকে কি ঘৃণা করিবে? অন্যকে ঘৃণা করিতে তোমার অধিকার নাই। আপনাকে চিনিয়া লও,এবং তাঁহাতে মজ,তাঁহাতে ডুব দেও। পরনিন্দা,ঘৃণা বিদ্বেষ এবং রোগ শোকের অতীত তবেই হইতে পারিবে। আর যদি বাহির লইয়াই থাক, তবে কথনও বুঝিতে পারিবে না, অন্তরের ধর্ম্ম কি?

ব্রাহ্মসমাজ—জাতিভেদ মহা সঙ্কটে। *

পৃথিবীতে খুব গোল চলিয়াছে—মানুষ সব এক, না, পৃথক্ পৃথক্;—জাতিভেদ বিধাতার নিয়ম,না, মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত সৃষ্টি? পৃথিবীর ধর্ম্ম বলিতেছেন,

---

* এই প্রবন্ধটী ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে নব্যভারতে প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৩০১ সালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্টের ইণ্ডিয়ান-মেসেঞ্জার পত্রিকা অবশেষে স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মসমাজে নানা রকমে জাতিভেদ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। See *Indian Messenger*, August 5, 1894—"Caste in the Brahmo-Samaj."

—সব মানুষ এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, সকলে ভাই ভাই,—ভেদাভেদ নাই, সকলই তাঁহার; অন্যদিকে পৃথিবীর দর্শন ও বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতেছেন,—পৃথিবীতে কোন দুটী প্রাণী একরূপ নয়—সকলই বর্ণগত, আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যে পরিশোভিত,—মানুষ সকল একের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও ঘোর বৈষম্যে অনুপ্রাণিত। ধর্ম্ম, চিরকাল মানবসমাজকে এক আধ্যাত্মিক পরিবারভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্ম, বর্ণগত বিভিন্নতা একদিকে, ধন ও বিদ্যাগত বৈষম্য অন্যদিকে ঘুচাইয়া, সকলই এক পিতার সন্তান—বড় ছোট ভেদ নাই বুঝাইয়া, সাম্যের সুমধুর স্বস্তি বচন উচ্চারণ করিয়াছেন; কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান—বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান,—প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, চিরকাল জগতে ভেদ-বোধের দুর্জ্জয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আপন গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। পৃথিবীতে ভেদবোধের অঙ্কুর কখনও উঠে নাই; কখনও যে উঠিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়?

এই মর্ম্মভেদী কথা কেন বলিতে সাহসী হইতেছি? ভাই, চাহিয়া দেখ, মহাত্মা ঈশার অলৌকিক প্রেমমূলক আত্মত্যাগ-মন্ত্র, শ্রীচৈতন্যের অহেতুকি ভক্তিমন্ত্র, মহাযোগী বুদ্ধের নির্ব্বাণমূলক গভীর বৈরাগ্য-মন্ত্র—এ পৃথিবীর অঙ্কে চির উজ্জ্বল থাকিতেও প্রজার প্রতি রাজার অত্যাচার, দরিদ্রের প্রতি ধনীর নির্যাতন, মূর্খের প্রতি জ্ঞানীর কঠোর তীব্র ঘৃণা, চিরকাল দুর্জ্জয় প্রভাবে রহিয়াছে, কখনও এ পৃথিবী হইতে উঠিল না! ধর্ম্ম পরিম্লান, না, বিজ্ঞান পরিম্লান? বড়-ছোট-ভেদবোধ এ পৃথিবী হইতে কখনও কি উঠিয়াছে?

এই সকল কথা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বড়ই নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। ধর্ম্ম, চিরকাল জাতিভেদ তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে, অথচ চিরকাল জগতে তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, কিন্তু তাহা মহা ভ্রান্তি। এ দেশের জাতিভেদ ব্যবসাগত ছিল মাত্র, ধর্ম্মের আচার ব্যবহারে উদার সার্ব্বভৌমিক হিন্দুধর্ম্ম চিরকাল আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান অধিকার দিয়া আসিয়াছেন—অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছে—অনেক দূষিত-চরিত্র ব্রাহ্মণ সমাজে হীন বলিয়া গণ্য হইয়া নিম্নস্তরে গিয়াছেন। সুপণ্ডিত রমেশ বাবুর অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাহসপূর্ব্বক লিখিতেছি, এখন হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ, প্রাচীন সময়ে সেরূপ ছিল না; বরং এরূপ বর্ণ-ভেদ তুলিতে ধার্ম্মিকগণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল?

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন রকম ব্যবসাগত জাতিভেদ হইতে সহস্র প্রকার জাতিভেদের অঙ্কুর দেশময় ছাইল!

পাশ্চাত্য দেশে মহাত্মা ঈশার আধিপত্য কত, সকলেই জানেন। সেখানে ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু সেখানকার ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর আর আর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জাতিভেদ লোপ করিতে পরাস্ত হইয়াছেন—কেবল মহাত্ম মহম্মদের দুর্জ্জয় বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে সাম্যের আসন, বোধ করি, একটু প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু তাহাও, বোধ হয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের তেমন চর্চ্চা না থাকা প্রযুক্তই হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জাতিভেদের কবলে গ্রাসিত হইয়াছে। প্রেম, সাম্য, একতা, এ পৃথিবীতে আকাশ-কুসুম, কথার কথা,—অন্তরের জিনিস কখনই হইল না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বিধান প্রচার করিতে ধরায় অবতীর্ণ, বিধাতা জানেন, কিন্তু আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি, জাতিভেদ নাশ করিয়া, বিধাতার অনাবিল প্রেম ও সাম্যের একতন্ত্রী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অতি সুন্দর প্রেম-পরিবার গঠন করা ইহার একটী উদ্দেশ্য। কথা এত মধুর যে, শুনিলে প্রাণ শীতল হয়। বাল্যকাল হইতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, অনেক ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন হইতে দেখিয়াছি, অনেককে অসবর্ণ বিবাহ করিতে দেখিয়াছি। এক সময়ে নানা ঘটনায় অলৌকিক প্রেমের পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম, বুঝি বা ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে অসাধ্য সাধন করিবে। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কি কুক্ষণে কুচবিহার-বিবাহে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্মতি প্রদান করিলেন,আর সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সমালোচনারূপ বাতাসে বিদ্বেষাগ্নি ভয়ানকরূপ প্রজ্জ্বলিত হইল,প্রেম, ভালবাসা তাহাতে ভস্ম হইল, ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রেমের স্থলে পরনিন্দা হৃদয় অধিকার করিল! কি এক দারুণ ভেদ-ঘোষণার নিশান আকাশে উঠিল! এই সময় হইতে জাতিভেদ-রাক্ষস নানা বেশে ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বনাশের দ্বারে উপস্থিত হইতে চলিল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "জাতিভেদ যদি ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকাইতে পারি, তবে ব্রাহ্মদের কোন আশা নাই ; তাহা হইলে আর হিন্দুধর্ম্ম লোপ করে, সাধ্য কার? আর ব্রাহ্মেরা যদি এ দেশের জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, হিন্দুধর্ম্মের কোন আশা নাই।"

আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য মোটেই স্বীকার করি না। হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাউক এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক, আমরা ইহা কখনও কামনা বা আশা করি না। পৃথিবীতে ধর্ম্মই জয়যুক্ত হউন, ইহাই আমাদের বাসনা। ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে জাতিভেদ থাকিতে পারে কিরূপে, আমরা বুঝি না। জগতের সজঞ্জাল বৈষম্যের হাটের মধ্যে কেবল প্রেম-বৃন্দাবনে ধর্ম্মের একটু দাঁড়াইবার স্থান আছে। সকল জাতির এক উপাস্য দেবতা ব্রহ্মাণ্ডপতির সম্মুখে যখন দাঁড়াই —রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা সব এক হইয়া যাই। সকলের লক্ষ্য তিনি, সকলের গতি তিনি, সকলের মুক্তি তিনিই। সকলের পরিণাম, এক মৃত্যুর পর, ঐ এক অমৃতময় সচ্চিদানন্দধাম। অধিকারীভেদে উপদেশের মাহাত্ম্য স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া একথা মানিনা—একজন মুক্তি পাইবে, —আর একজন চিরকাল নরকে পচিবে। তাঁহার অপার দয়ায় সকলে, নিস্তা-রের রাজ্যে চলিয়াছে। তিনি সকলেরই উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ভেদ-বোধ তোমার আমার নিকট—তাঁহার নিকট সকল সমান। কে পাপী, কে পুণ্যাত্মা? কে রাজা, কে প্রজা?—তাঁহার অপরাজিত দয়ার নিকট সব সমান। আমার ন্যায় পাপী কি আর আছে?—প্রকৃত ধার্ম্মিক ইহাই ভাবেন; আর ভাবেন, আমার প্রতি যখন তাঁহার এত দয়া, তখন কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। ভেদবোধের মূল প্রবর্ত্তক অহঙ্কার, বা আত্ম-সর্ব্বস্ব-জ্ঞান প্রকৃত ধর্ম্মে নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা, ঐ মৃত্যুর করাল গ্রাসে সকলের অহঙ্কার চূর্ণীকৃত। অমৃতময় রাজ্যে সকলে এক আসনে উপবিষ্ট। প্রকৃত ধর্ম্মের বাতাস বহিলে শরীর শীতল হয়, অহংবোধের উষ্ণতা চলিয়া যায়, মানুষ তৃণের ন্যায় দীন হইয়া সকলের পদধূলি মস্তকে লয় এবং প্রেমবৃন্দাবনে ভাই ভাই পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুখী হয়। জাতিভেদ রাখিয়া ধর্ম্ম করা যায়, ইহা জড়বাদ-মিশ্রিত ধর্ম্মের কথা, আধুনিক স্বার্থ-বিজ্ঞানের অসার চিন্তা-হীন কথা। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—এরূপ অসার কথার পরও আবার হাতে করতালি দিয়া লোক আনন্দ প্রকাশ করে। ভেদবোধের অঙ্কুর যে দিন হইতে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আত্ম-কলহসাগরে ডুবিয়াছে, ভাই ভাই পরস্পর বুকে ছুরি মারিয়া আত্মনাশ, সর্ব্ব-নাশ করিয়াছে। আজ যাঁহারা জাতিভেদ তুলিতে দণ্ডায়মান, তাঁহারা যে সকল কথা বলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে প্রণালীতে হিন্দুসমাজ ডুবিয়াছে, সেই প্রণালীতে কি ইহা জাগিবে? ইহা কখনই সম্ভব নহে।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একটী কথা কিন্তু ঠিক, "জাতিভেদ যদি ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকাইতে পারি, তবে ব্রাহ্মদের কোন আশা নাই ;" ইহা অতি পাকা কথা। জাতিভেদ ভাঙ্গিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি ; জাতিভেদ ব্রাহ্মসমাজে ঢুকাইতে পারিলে এ ধর্ম্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যে মরণ-ইতিহাসের কবলে ডুবিবে, কিছুই বিচিত্র নয়। কি আশ্চর্য্য, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা অল্প দিনেই যেন ফল ধরিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্বিবাদে পুড়িতেছে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়িতেছেন। ইহার পরিণাম কি, বিধাতাই জানেন।

যে ভেদবোধের অঙ্কুর জড়বিজ্ঞান জগতের অসংখ্য সমাজ বাগানে রোপণ করিতেছে, তাহার কথা বলিতেছি না ; কলহ, বিবাদ এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়া কিরূপে জাতিভেদ সর্ব্বাবয়বে ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিয়াছে, তাহারই কয়েকটী উদাহরণ দিয়া, এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

১। নববিধান ও সাধারণ সমাজের লোকেরা এখন যেন দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন। আদান প্রদান, আহার ব্যবহার দুই সমাজের লোকের মধ্যে প্রায়ই চলে না ; কোন কোন স্থলে চলিলেও নিন্দিত হয়। যেন দুই জাতি ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে বদ্ধমূল হইয়াছে।

২। ব্রাহ্মসমাজে পৌরহিত্যের আধিপত্য অল্পাধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। গুরুবাদ ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে খুব নিন্দিত ছিল, এখন নানা কারণে তাহা কতক মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এবং পৌরহিত্যের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন ধর্ম্মসমাজে একশ্রেণীর লোককে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরঙ্কুশ ধর্ম্ম প্রচারের ভার দিলে, এরূপ হওয়া অপরিহার্য্য। বিধাতাই, আমাদের মতে, একমাত্র ধর্ম্ম-প্রচারক। মানুষ যে পরিমাণে তাঁহার প্রচারিত সত্য প্রাণে ধারণ করিতে পারে, সেই পরিমাণে মানুষের চরিত্রের বল বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ চরিত্রের সুবিমল আভায় চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের জ্যোতি আপনি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। "নিজে ভাল হও, ধর্ম্ম প্রচার আপনি হইবে"—ইহা অতি মূল্যবান কথা। দুঃখের বিষয়, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পৃথিবীর লোক যত ব্যস্ত, নিজে ভাল হইবার জন্য তত নহে। প্রচারক, এ জগতের সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তিই, অথবা বিধাতার প্রচারিত সত্যে যাঁহারা উজ্জ্বল হইয়াছেন, এরূপ সকল মহাত্মাই। এক ব্রাহ্মণ জাতির উপর ধর্ম্মচর্চ্চার ভার ন্যস্ত করায় হিন্দুসমাজের আপামর সাধারণের যেরূপ অপকার হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট সমাজে প্রচারক শ্রেণী নিয়োগ প্রথায় যেরূপ এই সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায়

অভ্যুদিত হইয়াছে,ইহা স্মৃতি হইতে বিদূরিত না হইলে,কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-দল-গঠন প্রণালীর পোষকতা করিতে পারেন? মানুষের প্রচারের সহিত মানুষের ব্যক্তিত্ব জগতে বদ্ধমূল হয়, ব্যক্তিত্ব হইতেই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ব্যক্তিত্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজে দলের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজের অতি শ্রদ্ধেয় কয়েকজন প্রচারক, এই পথ ধরিয়া, শেষে গুরুবাদের আহুতিতে জীবন মন ঢালিয়া দিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া এখন ব্রাহ্মসমাজের সতর্ক হওয়া উচিত। এইস্থান হইতে ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক ভেদ-বোধের প্রথম অঙ্কুর সমাজে দেখা দিয়াছে।

৩। তারপর উপাসনা মন্দির। মানুষ সকলেই ভাই ভাই,—বড় ছোট, ধনী দরিদ্র সকলেই এক মায়ের সন্তান; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিলে আর এভাব মনে থাকে না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র মন্দিরের আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে মহাভুল করিয়া গিয়াছেন, সেই ভুল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজ-মন্দিরকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। কোন স্থানে ধনী বিদ্বান লোক বসিবেন, কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট উপাসকগণ বসিবেন, কোন স্থানে পরিবার লইয়া ব্রাহ্মগণ বসিবেন, ইত্যাদিরূপ নানা ভাগে সমাজ-মন্দির বিশেষরূপে চিহ্নিত বা রেল বেষ্টিত হইয়াছে। উপাসনামন্দির সার্ব্বভৌমিক ও উদার ভ্রাতৃভাবের উচ্চ সাম্যভাবে পূর্ণ হইবে,—না, বৈষম্যের লীলাস্থল হইয়া উঠিতেছে! মাঘোৎসবের সময় দৃশ্য আরো মর্ম্মভেদী হয়। মাঘোৎসবের সময় দূর দূরান্তর হইতে বহুব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে আগমন করিয়া থাকেন,কিন্তু এই অতি প্রিয় মাঘোৎসবের সময়,টিকিট প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এ জন্য অনেককে নিরাশ মনে উপাসনা-গৃহ হইতে ফিরিতে হয়। অনেক স্থান টিকিট-ওয়ালাদের জন্য রাখা হয়, এদিকে সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট অল্প স্থানে সকলের সঙ্কুলন হয় না। কোন স্থান শূন্য না থাকিলে কাহারও কোন কথা থাকেনা; কিন্তু মন্দিরে বিশেষ বিধান কেন? পৃথিবীর মধ্যে একটী স্থান আছে, যেখানে কোন ভেদ নাই, সব এক মায়ের সন্তান, বুঝা যায়। সে স্থান, উপাসনা-মন্দির। কিন্তু উপাসনা-মন্দিরে এইরূপ নানা শ্রেণীবিভাগ হওয়ায়, উদার বিশ্বজনীন প্রেম-সাধনে দারুণ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। কে প্রকৃত উপাসক, কে নয়, বিধাতা ভিন্ন কে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে? তুমি পণ্ডিত হইতে পার, তুমি ধনী হইতে পার, বা প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট উপাসক হইতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলিতে পার না,

বিধাতার সিংহাসনতলে অন্য ভাই অপেক্ষা তোমার অধিকার অধিক। আমি বলি, যদি তুমি প্রকৃত উপাসক হইতে, নূতন-আগত ভাইকে মধুর ব্রহ্মনাম শুনিতে আসন ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে। লোকেরা গোল করে, বিবাদ করে, এইজন্য এত চৌকিদারীর বিধান, এরূপ রাজযোগ্য বিধানের কথা ধর্ম্ম-সমাজে শুনিতে চাই না। প্রেমিক নিত্যানন্দের প্রেমের আকর্ষণে ভয়ানক দস্যু জগাই মাধাইর হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, স্মরণ রাখিবে। হায়, কবে সাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দির হইতে ভেদবোধরূপ কলঙ্কের চিহ্নগুলি উঠিয়া যাইবে! এই স্থান হইতে অহঙ্কারের আরম্ভ। এই স্থান হইতে শিশু, দরিদ্র ধনীর প্রভেদ শিখে, এই স্থান হইতে ভেদ-বোধের অঙ্কুর স্ত্রী পুরুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের এইরূপ কাজের জন্য যাঁহারা তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন,তাঁহাদের নেতৃত্বে সাধারণ-সম্পত্তি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে এইরূপ হইয়াছে,এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই! কত সাধু ব্যক্তিকে এজন্য লাঞ্ছিত হইয়া অবনত মস্তকে সমাজমন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইতে আমরা দেখিয়াছি! হায়, কবে এ কলঙ্ক ঘুচিবে!!

৪। ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনা-মন্দিরে যে দৃশ্য দেখা যায়,এখন ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই সেই দৃশ্য। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ, এখন ভয়ানকরূপে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মের বাড়ী কেহ মরিলেও কেহই সে দিকে বড় তাকায় না, কিন্তু ধনী ব্রাহ্মের গৃহে সামান্য একটু রোগ উপস্থিত হইলে দলে দলে লোক যাতায়াত করে। যেন, বন্ধুত্ব এ সংসারে কেবল ধনীর সহ শোভা পায়! কোন সভাস্থলে গেলে দেখা যায়, ধনী লোকদিগকে লইয়াই আদর অভ্যর্থনা হইতেছে, দরিদ্রদিগকে মলিনভাবে একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হই-তেছে। মফঃস্বলের কোন এক স্থানে একজন দরিদ্রের গৃহে ও আর কোন স্থানে একজন ধনীর গৃহে একই সময়ে উৎসব হউক, দলে দলে লোক ধনীর বাড়ী ছুটিবে। মফঃস্বলের দরিদ্র ব্রাহ্মেরা দীর্ঘকাল পত্র লেখালেখি করিয়াও প্রচারক পান না, আর ধনী ব্রাহ্মদের ইঙ্গিতমাত্র একজনের স্থলে বহু জন প্রচারক উপস্থিত হন। টাকার জোর খুব বেশী, কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু ধর্ম্মসমাজে টাকার চেয়ে ধর্ম্ম ও সাধুতারই আদর অধিক হওয়া উচিত। আর দৃষ্টান্ত দিতে চাই না। ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন, ব্রাহ্মসমাজে ধনী দরিদ্রের ভেদ এমন স্পষ্ট রেখায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা জাতিভেদের এক অপকৃষ্ট চিত্র।

৫। বিদ্বান ও মূর্খের প্রভেদ সর্ব্ব দেশে,—ব্রাহ্মসমাজেও। একজন বিদ্বান ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সভায় দশটা অসার,অসংলগ্ন, যুক্তিহীন কথা দশবার বলিলেও, লোকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহা শুনিবে, আর একজন অশিক্ষিত সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় কথা একবার ছাড়া দুই বার বলিতে চাহিলেই লোকে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিবে। বিদ্যার আদর বৃদ্ধি পাউক, দুঃখ নাই; কিন্তু ধর্ম্মসমাজে চরিত্র ও সাধুতার আদর সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজে সে দৃশ্য দিন দিনই বিরল হইতেছে। মফঃস্বলে বহু সাধুচরিত্র অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ব্রাহ্ম আছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজ টিকিয়া রহিয়াছে। মাঘোৎসবের সময়, দেখিয়াছি, তাঁহারা অনেকে কলিকাতা আগমন করেন; কিন্তু তাঁহা-দিগকে মন্দিরে কখনও উপাসনার কাজ করিতে দেওয়া হয় না। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির সাধারণের—অথচ এখানে উপাসনার কাজ করিবার অধিকার দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত ও সাধু ব্রাহ্মদের নাই। ইহা কম পরিতাপের কথা নয়।* আমাদের মনে হয়, মফঃস্বলের সকল ভক্তদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া, পালাক্রমে, মাঘোৎসবের সময় মন্দিরে উপাসনার কাজ করিতে দিলে—মাঘোৎসবে এক অলৌকিক দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। এরূপ করিলে পৌরহিত্য লোপ পায়, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ দূর হয়, ধনী দরিদ্র সমান অধিকার পাইয়া ধর্ম্মের আভায় সমাজকে উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয়। সকলের সমবেত শক্তি, এইরূপে, স্ফুরণের অধিকার পাইলে, ব্রাহ্মসমাজ কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইবে, বিধাতাই জানেন।

৫। আদান প্রদান, আহার ব্যবহারেও দিন দিন জাতিভেদের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দিন দিন অসবর্ণ বিবাহ লোপ পাইতেছে; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে, কায়স্থ কায়স্থে, বৈদ্য বৈদ্যে, পাত্রপাত্রীর বিবাহ দিতে ব্রাহ্মগণ দিন দিন লালা-য়িত হইতেছেন। নীচ জাতিতে কন্যার বিবাহ দিলে কন্যার অধোগতি হইবে, বংশগত দূষিত আচার ব্যবহারে সংক্রামিত হইবে, এরূপ আশঙ্কা অনেকে

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা বৎসরান্তে কেবল মাঘোৎসবের সময়েই হয়; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আছেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য নাই। কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উপা-সনার কথা বলিতেছি না, তাঁহাদের যেমন ইচ্ছা করুন। সম্বৎসর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়া মাঘোৎসবের সময়ে যে উপাসনা করেন, আমরা এ স্থলে সেই উপা-সনায় ব্রাহ্ম-সাধারণের যে উপাসনা করার অধিকার নাই, ইহাই বলিতেছি।

করেন। প্রথম পুরুষে এরূপ অধোগতি কতক অনিবার্য্য স্বীকার করি, কিন্তু শেষে ক্রমে এ ভাব দূর হইবে। এইরূপ আদান প্রদান ব্যতীত, উচ্চ বংশের উচ্চ নীতি নীচকুলে বদ্ধমূল করার আর উপায় নাই যখন, তখন আর স্বার্থপর হইলে চলিবে কেন? কেবল তোমার আমার নয়, এই আদান প্রদানের উপর ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নতি নির্ভর করিতেছে। অসবর্ণ বিবাহ এই ভারতে প্রচলিত না হইলে ভারতীয় জাতির আর উন্নতির উপায় নাই। ব্রাহ্মসমাজ অসবর্ণ বিবাহ প্রথা সঙ্কুচিত করিলে দেশের মঙ্গল নাই। ব্রাহ্মবিবাহের তালিকা গ্রহণ করিলে দেখা যায়, এখন সবর্ণ বিবাহই অধিক হইতেছে। কেবল যে সবর্ণে আদান প্রদান চলিতেছে, তাহা নহে; ধন ঐশ্বর্য্যেও আদান প্রদান এখন কতক নির্ভর করিতেছে। কোন দরিদ্র সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম এখন আর ধনী ব্রাহ্মগৃহে বিবাহ করিতে আশা করিতে পারেন না। কোন ধনীর সন্তান দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে চাহিলে নানারূপে বাধা দেওয়া হয়। অনেকের বিবাহ-ইচ্ছা, এইরূপে, মুকুলেই বিনষ্ট হয়। তবে বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিদের কিছু আশা আছে। দরিদ্র হইলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার জোরে, ভাবী ধনের মায়ায় ভুলাইয়া, ধনীকে কেহ কেহ প্রলুব্ধ করিতে পারেন। কিন্তু এখানকার শিক্ষা বা চরিত্র বল—যাহা থাকুক, ধনীর গৃহের কন্যা পাওয়া কষ্টকর। আদান প্রদানের মধ্য হইতে এই ধনলিপ্সারূপ অন্তরায় বিদূরিত না হইলে, ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের ন্যায় কন্যাপণে সবর্ণের ধনীবর সংগৃহীত হইবে। তাহা হইলে, মনোনয়ন প্রথায় যে কি ভয়ানক আঘাত পড়িবে, সে বিষয় ভাবিলেও কষ্ট হয়। আদান প্রদান সম্বন্ধে এতদূর অধোগতি হইয়াছে যে, নিম্নজাতি হইতে আগত ব্রাহ্মদিগের পুত্র কন্যার বিবাহের চিন্তায় অনেকে কাতর হইয়াছেন। এই অধোগতি না থামিলে, নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের আর উপায় নাই।

আহারে ব্যবহারে কিরূপ জাতিভেদ প্রবেশ করিতেছে, বলিতেছি। আমরা জানি, কোন কোন নীচ জাতি (যেমন মুচি) হইতে আগত ব্রাহ্মের বাড়ী আহার করিতে কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন। মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ঝি চাকরের ভয়ে, তাঁহাদিগকে বাড়ীতে রাখিতে অনেকে সঙ্কুচিত হন। ইহা ভিন্ন ধনী দরিদ্রের প্রভেদ, তাত আছেই। ধনীর ঘরে এখন ধনীরই নিমন্ত্রণ হয়। পণ্ডিতের ঘরে পণ্ডিতেরাই নিমন্ত্রণ পান। কাজেই দরিদ্রের ঘরে এখন দরিদ্রের নিমন্ত্রণ হয়। দরিদ্রের গৃহে বড় লোকের

নিমন্ত্রণ হইলেও তাঁহারা বড় একটা আসেন না। কাহাকে কাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা নয় ধরা পড়িয়াছি, পুত্র কন্যাদিগকে নীচ ঘরে বিবাহ দিয়া বা যেখানে সেখানে খাইতে দিয়া চিরকালের জন্য অ-চল করিয়া যাই কেন ?" ইহা ভিন্ন, পংক্তিভোজনেও জাতিভেদাঙ্কুর দেখা দিয়াছে। অমুক লোক মুচি, উহার সহিত খাইব না ; অমুক লোকটা অন্যায় কাজ করিয়াছে, সুতরাং অমুকের সহিত আহার করিব না,—এরূপ কথা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে, আপত্তিজনক লোকের আগমন জন্য, কেহ কেহ উঠিয়া যাইতেও আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজ, অপরাধী ব্যক্তিদিগের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতে এখন মধ্যবর্ত্তিতা করিতেছেন। হিন্দুসমাজে যে এইরূপ করিয়াই জাতিভেদ প্রবেশ করিয়াছে, একথা ভুলিয়া, নেতৃবর্গ এখন জ্ঞানহীন বালকের ন্যায় পংক্তি-ভোজনে সমাজ-শাসন বিধিবদ্ধ করিতেছেন। এ সকল এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহার গুণ ঘোষণা করিতেও সময়ে সময়ে এখন লোক দেখা যায়।

আরো কথা আছে। এখন পতিত লোকের পুত্র কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজ ঘৃণার সহিত পরিহার করিতেছেন। পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ নহে, ইহা যেন কেবল বাহ্যসর্ব্বস্ব পুণ্যাত্মাদিগের জন্য! আমরা জানি, ঘটনার পীড়নে, যৌবনের তাড়নায় কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি পদস্খলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে আশ্রয় দিতে সমাজ এখন কুণ্ঠিত হইতেছেন। পতিত লোকের সন্তান দূরে থাকুক, পূর্ব্বে কত পতিত লোককে সমাজ আশ্রয় দিয়াছেন। এখনকার ব্যবহার যে ভেদ-বোধের কি বিকৃত গর্ব্ব-দুষ্ট, লিখিতেও লেখনী কাঁপে। হা ধর্ম্ম, হা সাম্য, হা প্রেম !!

এই সকল জাতিভেদের নানা লীলার অভিনয় দেখিয়া আমরা হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইতেছি—এবং ব্রাহ্মসমাজে এরূপ ভাব দিন দিন প্রশ্রয় পাইলে, এ সমাজ টিকিবে কিনা, সন্দিগ্ধ হইতেছি। এখন নানা রূপের নানা ঘটনায় অপ্রেমের পরিচয় পাইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছি, এবং বলিতেছি—কোথায় খ্রীষ্ট, কোথায় শ্রীচৈতন্য, তোমরা আর একবার অভ্যুদিত হইয়া সোণার সংসারকে রক্ষা কর। "নিতাই যারে পায় দেয় কোল, কোল দিয়া বলে, হরিবোল"—তোমরা এই উদার কথা ঘোষণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে—আর একবার আসিয়া দেখ, পৃথিবীর এখন কি দুর্দ্দশা উপস্থিত! আর জেনেরেল বুথকে ডাকিয়া বলি, মহাত্মন্, তুমি একবার এই অপ্রেমের

লীলাস্থল ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পদার্পণ করিয়া, তোমার তেজোময় ভাষায়, তোমার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, স্বর্গীয় প্রেমের (Love) মোহনমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিয়া চলিয়া যাও। যে জাতিভেদে ভারত ডুবিয়াছে,সেই জাতিভেদ ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিলে এই অধঃপতিত দেশের আর আশা কোথায় ? বিধাতা আমাদের সহায় হও, দরিদ্রদিগের উপায় কর, এবং দরিদ্র ব্রাহ্মসমাজকে জাতিভেদ মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর।

দান ও গ্রহণ।

এই ভারতবর্ষে সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়,—এক শ্রেণীর লোক অবিচারিত ভাবে দান করিতেছে; আর এক শ্রেণীর লোক ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। যাহাদিগের ধনসম্পত্তি আছে, তাঁহারাই দিতেছেন; আর যাহাদের কল্পিত বা প্রকৃত সম্পত্তি অভাব, তাহারাই প্রত্যাশী হইয়া গ্রহণ করিতেছে। দাতারা দিয়া দিয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত; গৃহীতারা পাইয়া পাইয়া বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, আরো পাইবার আশায় মাতিতেছে। দাতারা কি ভাবিতেছেন, গৃহীতারাই বা কি করিতেছে, একবার অনুধাবন করি।

মৌমাছি যেরূপ মধুচক্রকে সর্ব্বক্ষণ একাগ্রচিত্তে ঘেরিয়া থাকে, গৃহীতারা দাতাদিগকে, সেইরূপ, সর্ব্বক্ষণ আবেষ্টন করিয়া থাকে। ভিখারীর ভয়ে, এই পৃথিবীর অনেক ধনী লোক হস্তকে চিরকালের জন্য বিশ্রাম দিয়াছেন; দ্বারে অনাহারে লোক মরিলেও অনেক ধনী সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না! কেন না, তাঁহারা জানেন, যাঁহারা একবার হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এ জীবনে আর তাঁহাদিগের হস্ত গুটানের সম্ভাবনা নাই;—বিষয় সম্পত্তি সমস্ত নীলামের করে সমর্পণ করিয়াও তাঁহারা নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহারা জানেন, অযথা দানে পুণ্যের পরিবর্ত্তে বৃথা মানুষকে অলস করা হয়, অথচ ভিখারীর মনোবাঞ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না। ধনস্পৃহা কখনও মানুষের কমে না। দশ পাইলে শত, শত পাইলে সহস্র, সহস্র পাইলে লক্ষ পাইতে মানুষের সাধ যায়। কেবল তাহাই নহে। এক জনকে দশ পাইতে দেখিলে অপর ভিখারীর শত পাইতে বাসনা হয়। না পাইলে, দাতার চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করিয়া তবে সে ক্ষান্ত হয়। একজনকে তৃপ্ত কর, দশজন হাজির হইবে; দশজনকে তৃপ্ত কর, শত;

শতকে কর, সহস্র ভিখারী তোমার দ্বারস্থ হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষে কোটী কোটী ভিখারীর উদ্ভব হইয়াছে। বিনাক্লেশে দিনগুটানের ইহা অপেক্ষা আর সহজ উপায় নাই! তুমি যত বড় ধনীই হও না কেন, কত দিন তুমি এরূপ ভিখারীর অভাব দূর করিতে পারিবে, বলত? চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু তাহার পরিণাম কি? যাহাকে দশ দিয়াছ, সে বলিতেছে, শত দিলে না কেন? যাহাকে শত দিয়াছ, সে আক্ষেপ করিয়া রটনা করিতেছে, সহস্র দিলে না কেন? দিয়া ত তুমি কেবল অপযশই ক্রয় করিতেছ; অথবা দিয়া দিয়া কেবল মানুষকে অলস করিতেছ; পৃথিবীর ইহাতে কোন উপকার নাই। মানুষের শক্তি, এই রূপে, নিঃশেষ করিয়া তুমি নরহত্যাপরাধে অপরাধী হইতেছ। কৃপণ ধনীরা এইরূপ কথা বলেন! এই সকল কথার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা নহে; কিন্তু কোন কোন সদাশয় ধনী, ভাবোচ্ছ্বাসে, অপরের অভাব দেখিয়া ঠিক থাকিতে পারেন না; দিবার প্রবৃত্তিতে যেন মাতোয়ারা। পতঙ্গ আগুনে পড়িবার জন্য যেমন উল্লসিত, তাঁহারাও অন্যের বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিতে তেমনই লালায়িত। এই আগুনে পড়িতেছেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশতঃ আর উঠিতে পারিতেছেন না; কাহার প্রকৃত অভাব, শেষে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কাজেই অবিচারিতভাবে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা!

আমরা একজন সদাশয় ধনীর কথা জানি। তিনি যেন দান করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইষ্ট বন্ধু ও কুটুম্বদিগকেও জানি। যাঁহাদিগকে জানি, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায়ের চেষ্টায় আছেন। এতদিন তিনি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, এখন তাঁহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এক দিন দুঃখ করিয়া তাই বলিতেছিলেন—"এখন লোক দেখিলেই ভয় হয়, মনে হয়, এও বুঝি কিছু চাহিতে আসিতেছে। দিবানিশি, যে ব্যক্তি কাছে আসে, সে-ই কিছু চায়; হায়, টাকাকড়ি ত দূরের কথা, একটু নিঃস্বার্থ প্রেমও কেহ দেয় না। দিয়া দিয়া এখন শ্রান্ত হইয়াছি, আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিছু দিনের জন্য দান বন্ধ করি!" যে দিন বন্ধু এইরূপ বলিলেন, তার পর দিনই শুনিলাম, তিনি আবার বহুজনকে বহু টাকা দিয়াছেন। এই বন্ধু যতজনের উপকার করিয়াছেন, যতজনের সাহায্য করিয়াছেন, তিনি

আর একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন, সে সকলেই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা এবং নিন্দা ঘোষণা করিতেছে। আমরাও তাঁহার প্রশংসা বড় একটা কাহারও নিকট শুনি নাই। পাইয়া পাইয়া,সকলেই তাঁহার নিকট হইতে আরো আদায়ের জন্য লালায়িত। আত্মমর্য্যাদাবোধ এখন এত হীন হইয়াছে যে, ভিক্ষা করা এখন একশ্রেণীর লোকের স্বভাব হইয়াছে। বিবিধ প্রকারে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তবে যেন গৃহীতাদের ব্রত সাঙ্গ হইবে! দিন দিনই এজন্য লোকের গতায়াত বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিনই আবেদন সংখ্যা বাড়িতেছে। চক্ষুলজ্জায় বা ভাব-দায়ে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অকূল দান-সাগরে যেন ভাসিতেছেন !!

আমরা একজন গৃহীতাকেও জানি। তিনি সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী। তিনি প্রেমিকও বটেন। তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস এই, জগৎ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। ধনী লোকদের ঘরের অতুল ধনরাশি যেন তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্যের জন্যই। তিনি পাইয়াছেনও অনেক, কিন্তু অনেক চতুর লোক, তাঁহাকে সোজা পথ দেখাইয়া কেবল অনুরোধ-পত্রে, দয়ার ভার অপরের হাতে দিয়া, বিদায় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তিনি ইদানীং বড় বিরক্ত হইয়াছেন, এক দিন আক্ষেপ করিয়া তাই বলিতেছিলেন, "লোক গুলো অধঃপাতে গিয়াছে, হাতে জোলাপ দিলেও কিছু বাহির হয় না।" এইরূপ গালাগালি দিবার পরক্ষণেই তাঁহাকে আবার অন্যের দ্বারস্থ হইয়া কিছু চাহিতে দেখিয়াছি। যে ব্যক্তি এক সময়ে অন্যকে গালি দেয়, সেই লোকই সময়ান্তরে অন্যের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা চায়! আত্মনির্ভরের এতই সম্মান! সে যেন নিজের হাতকে সদা উন্মুক্ত রাখিয়াছে—যেন যে চাহিতেছে, তাকেই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছে! নিজের হাত গুটাইয়া, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া ও অন্যকে এইরূপে গালি দেওয়া কিম্বা মানুষের দয়ার উপর জোর জবরদস্তি করা ধর্ম্ম কি না, জানি না; কিন্তু ইহা জানি, ইহার জন্যই অনেক দাতা কৃপণ হইয়াছেন, অনেক ধনী চিরদিনের জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। অন্যদিকে, অনেক লোক, অবস্থা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও, ভিখারীর দলে নাম লেখাইয়া অলসতার প্রশ্রয় দিতেছে। সকলেরই সীমা আছে। অবিচারিত দানেরও সীমা থাকা উচিত, অবিচারিত গ্রহণেরও সীমা থাকা উচিত। নিজের শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও যে উদরান্ন না পায়, সে যদি ভিক্ষা করে, তবুও সহ্য হয়; নিজ শক্তি না খাটাইয়া, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া যে কতদূর নীতি-বিরুদ্ধ

কাজ, কে না জানে? দান করিয়া রাজা পথের ভিখারী হইবেন, ইহাও ভাল নয়; ভিক্ষা করিয়া লোক অলসতার দুগ্ধনিভ শয্যায় শয়ন করিবে ও চর্ব্ব্য চোষ্য দ্বারা দেহ পুষ্ট করিবে, এবং অন্যের নিন্দা দ্বারা জিহ্বা কলুষিত করিবে, ইহাও ভাল নয়।

বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা, এই জন্য, উভয় শ্রেণীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁহারা অন্যকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিয়া দয়ার ভার অন্যহস্তে ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা মানুষকে স্বাবলম্বনের অতিরিক্ত স্থানে যাইতে দিতে তত অভিলাষী নহেন। এইজন্য, সদাশয় ধনী এবং উদার (?) ভিখারী উভয়ই তাঁহাদিগকে কৃপা ও ঘৃণার চক্ষে দেখেন! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কি ঘোরতর অন্যায় করেন?

তোমার পিতার শ্রাদ্ধে ঘোরঘটা হয় না, তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তোমার কন্যাদায় উপস্থিত, কিম্বা তোমার তীর্থ দর্শন বা ধর্ম্মপ্রচার হয় না, কিম্বা আর কোন ভাল কাজ হয় না,—তোমার দরিদ্রের সেবা কি দেবসেবা হয় না, সে জন্য ধনীর কি, বল ত? বিধাতা তোমারও হাত পা দিয়াছেন, তাঁহারও দিয়াছেন; তিনি হাত পা খাটাইয়া বা পুণ্যবলে তাঁহার পিতার অর্জ্জিত দশ টাকা পাইয়াছেন, তুমি তাহা পাইবার জন্য বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছ কেন? তোমার শক্তি খাটাইয়া দশ টাকা সঞ্চয় কর, ব্যয় কর, পিতৃদায়, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হও। তুমি এত দিন চেষ্টা কর নাই, সে জন্য অন্যে দায়ী হইতে পারে না। তুমি একটা ধর্ম্মমত জীবনের সার করিয়া ধরিয়াছ, জগতের দ্বারে তোমার সেই মত দিতেই হইবে? কেহ বাধা দিতেছে না, দেও, প্রচার কর; কিন্তু সে জন্য অন্যের নিকট প্রত্যাশা কর কেন? বিধাতা তোমার কি সর্ব্বজন-সুলভ হাত পা দেন নাই? তুমি পরোপকার ব্রত লইয়াছ, ভাল কথা, তুমি অর্থোপার্জ্জন কর, চাকুরী করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন কর,—দরিদ্র-সেবায় অকাতরে তাহা ব্যয় কর, কে নিষেধ করে?—অন্যের দয়ার উপর জোরজবরদস্তি কর কেন? অন্যে অযাচিতভাবে তোমার সাহায্য করেন, ভালই, গ্রহণ কর, কিন্তু অন্যে সাহায্য করে না বলিয়া বৃথা নিন্দা কর কেন? দয়ার উপর কি জবরদস্তি চলে? কে তোমাকে ঐ ব্রত নিতে অনুরোধ করিয়াছে? গরীবদের ছোট ভগ্নীরা (Little sisters of the poor) চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, সেই অর্থ অকাতরে দরিদ্রের জন্য ঢালিতেছেন। তাঁহাদের স্বামী-সেবা নাই,

পুত্র-সেবা নাই, জীবনে কেবল ঐ এক কাজ। আমরা নরাধম, ঐ দৃষ্টান্ত দেখিতে পারি, কিন্তু প্রাণে পূরিতে পারি না। আমাদের বৎসর বৎসর সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে, এবং পরসেবার ভাণ করিয়া অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে! এবং কেহ কিছু না দিলে, গালাগালির চোটে গগন ফাটাইতে হইবে! অহো দুর্ভাগ্য! যে দেশের রাস্তায় রাস্তায় কোটী কোটী ভিখারী অন্যের প্রত্যাশায় অলসভাবে দিন কাটায়, সেই দেশে আবার কত কত কর্ম্মক্ষম, জ্ঞানী, মানী, সুসভ্য ভিখারীর অভ্যুদয় হইতেছে !!

আমরা বড় কঠিন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ভিক্ষা করিয়া সংসার চালান যদি দোষের হয়, তবে ভিক্ষা করিয়া সৎকাজ, পরোপকার করাও দোষের। আমার পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিধাতা এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমাকে কৃষক-রূপে পাঠাইয়াছেন। আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হইবে, তবে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার রাশি রাশি টাকা আছে, আমার তাহাতে কি? আমার শাকান্ন আমাকেই পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য আমার পরিশ্রম ও স্বোপার্জ্জন যদি প্রয়োজন, তবে অহেতুকী প্রেমের টানে আমার দুঃখী ভাই, আমার দরিদ্র পৃথিবীর ভার যখন আমার মস্তকে লইব, তখন তাঁহাদের জন্যও আমার ঐরূপই আবশ্যক। আমি যদি পৃথিবীর দুঃখী দরিদ্র লোককে আমার পুত্রকন্যার ন্যায় আপন জ্ঞানে প্রতিপালন করিতে না পারি, তবে তাহাদের ভার আমার গ্রহণ করা উচিত নহে; কেননা, কেবল দয়াতে পরের উপকার হয় না, প্রাণের টানে হয়। তাহারা যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই তাহাদের জন্য আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে প্রবৃত্তি হইবে, এবং তখনই আমি তাহাদের সেবায় আসিব। নচেৎ আর যে সকল পরোপকার ব্রত গ্রহণ, তাহা কেবল ভণ্ডামী মাত্র—কষ্ট-পরিশ্রম-শূন্য সুলভ যশ লাভের পন্থা মাত্র। এ ব্রত-পালনে, এই কঠোর সময়ে, লোকের প্রশংসা পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট পুরস্কার বা পুণ্যলাভের আশা নাই। ধর্ম্মের নিকট পুরস্কার তখনই পাওয়া যায়, যখন লোক নিষ্কাম হইয়া, আপন পুত্র কন্যার ন্যায়, জগতের নরনারীর সেবা করিতে পারে। তাহাই পৃথিবীর স্বাবলম্বনের প্রথম সোপান—তাহাই বৈকুণ্ঠের মুক্তির পবিত্র সিঁড়ি।

পিতা পুত্র সম্বন্ধ, পৃথিবীর বড়ই মধুর ও পবিত্র সম্বন্ধ। পিতা দিতেছেন, পুত্র নিতেছেন। পিতার মনেও ক্লান্তির বা শ্রান্তির ভাব নাই, পুত্রের মনেও কামনা, আশা বা নিরাশা নাই। পিতা যাহা দেন, পুত্রের তাহাই শিরোধার্য্য, পুত্র তাহাতেই কৃতার্থ। পিতা দিতেছেন, তাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, দিবার জন্য কেহ তাঁহাকে অনুরোধও করিতেছেন না। এখানে কোনরূপ অনুরোধ উপরোধ নাই। না দিলেও পুত্র পিতার নিন্দা করেন না, বা বহু দিয়াও পিতা মনে করেন না যে খুব দিয়াছি। এখানে দান ও গ্রহণ আছে, কিন্তু উভয়ই মানুষকে স্বাবলম্বন-পথে লইয়া যাইতেছে। পিতা, নিষ্কামভাবে দান করেন, পুত্র নিষ্কামভাবে গ্রহণ করেন। পিতা অসহায় শিশুকে মানুষ করিবার জন্য বিধাতার আদেশে খাটিতেছেন, পুত্র অসহায় অবস্থা হইতে নিজ শক্তির উপর দাঁড়াইবার জন্য বিধাতার ইচ্ছায় পিতার সাহায্য লইতেছেন। * এখানে দান ও গ্রহণ আছে, কিন্তু স্বাবলম্বনও অছে। এই রূপ দান ও গ্রহণই আদর্শ। ইহার মূলে স্বর্গের প্রেম। ভাবোচ্ছ্বাসে নহে, কিন্তু এই স্বর্গের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি মানুষ অযাচিতভাবে দান করে, তাহা সার্থক হয়; আর এই প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া বিনা প্রার্থনায় কিছু পাওয়া যাইলে যদি কেহ তাহা গ্রহণ করে, তবে স্বাবলম্বনে ব্যাঘাত হয় না। এই নিষ্কাম প্রেমের অভাবেই, ধনী, ভাবোচ্ছ্বাসে দান করিয়া, শেষে আক্ষেপ করেন, এবং ভিখারী বা প্রার্থী, পাইয়াও, আশা-নিবৃত্তি না হওয়ায়, দাতার নিন্দা করিয়া রসনাকে কলুষিত করে।

আর একটী চিত্র আছে;—মানুষের লক্ষ্য, এই পৃথিবী নয়, এ পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়। মানুষের লক্ষ্য, কেবল ঈশ্বর। ঈশ্বরমুখী প্রাণই নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদন বুঝে। সে প্রাণ পৃথিবীর কিছুই চায় না, সে ধন ঐশ্বর্য্য, টাকা কড়ি, যশ মান কোন দিকে তাকায় না; সে কেবল বিধাতার কৃপার জন্য লালায়িত। সে দান করেও তাঁহার ইচ্ছাতে, অথবা সে গ্রহণ করেও, তাঁহারই ইচ্ছায়। অথবা তাঁহারই জিনিস তাঁহার নিকটে লইয়া তাঁহাকেই দেয়। সে, অভাব হইলেও কাহারও দ্বারে যায় না, পিতার চরণই ধরে; সে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইলেও রাখে না, পিতার সন্তানদিগকে বাঁটিয়া দেয়। পাইলেও তাঁহার উল্লাস নাই, না পাইলেও ক্ষোভ নাই। দিলেও তাঁহার বিরক্তি নাই, খুব পাইতেও আসক্তি নাই। সে, সকল অবস্থার মধ্যে নিশ্চিত মনে, একেরই লীলা দেখে এবং

* এইস্থল পাঠ করিবার সময় জমিদার পিতা পুত্রের কথা পাঠকগণ বিস্মৃত হইবেন; কেননা সেখানে স্বাবলম্বন ব্রতের ভয়ানক অন্তরায় আছে।

তাহাতে মজে। সে চায় ত পিতার নিকটই চায়,সে দেয় ত পিতার সন্তানকেই দেয়। ভাবোচ্ছ্বাস তাহার নাই, সে স্বর্গীয় প্রেমে সঞ্জীবিত। এখানে ক্লান্তি নাই,শ্রান্তি নাই,—এখানে নিন্দা নাই,গ্লানি নাই। তাহার লক্ষ্য পৃথিবীর কিছুই নয়—লক্ষ্য নীরবে দাঁড়াইয়া কেবল জগজ্জননীর পূজা,বিশ্বপিতার পূজা করা। লক্ষ্য—আপনার ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহকে তাঁহার আনুগত্যে খাটাইয়া তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করা। লক্ষ্য—চিরকাল তাঁহারই চরণে জীবন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া। সেই অবলম্বনই স্বাবলম্বন। সেই স্বাবলম্বনই অধীনতা। সেই অধীনতাই মুক্তি। সে,প্রাণে মরিলেও, মানুষ জ্ঞানে মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে না, সে অনাহারে মরিলেও বলিবে—"Thy will be done." দিতে হয়, তিনিই দিবেন ;—না দিতে হয়, তিনি দিবেন না,—সদা এই চিন্তায় বিভোর থাকিয়া যে ব্যক্তি সংসার-নিরপেক্ষ, বাসনা ও কামনা বিরহিত হইয়াছেন,তিনি দাতাই হউন বা গৃহীতাই হউন, কিছুতেই তাঁহার চিত্ত-বিকার নাই। অর্থাৎ দান ও গ্রহণ,যখন বিধাতার ইচ্ছানুপ্রাণিত কাজ,তখনই তাহা পবিত্র ও পরম মঙ্গলের পথ ; আর যখন মানুষের ইচ্ছা বা ভাব-প্রসূত, তখনই নরক। তাঁহার ইচ্ছাতেই দিতেছি, যিনি মনে করেন, তিনিই প্রকৃত দাতা ; তাঁহার ইচ্ছাতেই লইতেছি, যিনি ভাবেন,তিনিই প্রকৃত যোগী। অহংজ্ঞান সর্ব্বস্ব করিয়া যাঁহারা চলেন, তাঁহারাই পরিণামে দুঃখ পান। বিধাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহার ইচ্ছাতে যখন মানুষ চলে, তখন দানে ক্লান্তি নাই, গ্রহণেও আসক্তি নাই ; দানে অহঙ্কার নাই,—গ্রহণেও প্রার্থনা বা জোর জবরদস্তি নাই। অথবা তখন অবিচারিত দানও থাকে না, অসংযত প্রার্থনা বা গ্রহণও থাকে না। কে দাতা, কে বা গৃহীতা, প্রকৃত ভক্ত সাধকের পক্ষে, ঈশ্বরানুগত সাধুব্যক্তির পক্ষে, ভবের সকলেই একের ইচ্ছাচালিত দাস দাসী। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, অন্নপূর্ণাই লুটাইয়া দিতেছেন। অন্নপূর্ণা, রূপান্তর ধরিয়া, আবার তাহা লইতেছেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া, তাঁর ইচ্ছাতে যে দান করে, দানে তার ভাণ্ডার আরো পরিপূর্ণ হয়। তাঁর দিকে চাহিয়া তাঁর ইচ্ছাতে যে গ্রহণ করে, সে যাহা পায়, তাহাতেই তৃপ্ত, অল্প পাইলেও পুনঃ চায় না, সহস্র পাইলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করে না। বাসনার আগুনে সে পুড়ে না, সে দয়ার উপর জোর জবরদস্তি চালাইতে চায় না। এই অবস্থায় দুই জনই আত্মবিস্মৃত, কামনা-রহিত। যশের কুহকে, ভাবের প্ররোচনায় দাতা এখানে দান-ব্রত লন নাই, গৃহীতাও কল্পিত ভেক ধরে নাই। যশ মানের কুহকে

যেখানে দান বা গ্রহণ,সেখানে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধ হওয়া অনিবার্য্য। যশ বা মানের কুহকে যেখানে সেবাব্রত বা ভেক গ্রহণ হইয়াছে, সেখানে বাসনা-নির্ব্বাণ আকাশ-কুসুম। সেখানে দানে কলঙ্ক,—অহঙ্কারের স্ফূর্ত্তি; গ্রহণে অলসতার বৃদ্ধি,—স্বাবলম্বন ও আত্মমর্য্যাদা-নির্ব্বাণ। সেখানে দাতা দান করিয়া অহঙ্কারে মত্ত, মনে করেন, আমার ন্যায় আর দয়ালু লোক নাই; গৃহীতাও আসক্তি-মত্ত, মনে করে, তাহাকে লোকে দিতে বাধ্য, তাহাকে দিবার জন্যই সকলের ধন ঐশ্বর্য্য! দানেও কলঙ্ক, হায়, এখানে গ্রহণেও কলঙ্ক!! নিষ্কাম-ব্রত পালন, এ সংসারে, আজকালকার দিনে বড়ই শক্ত কথা হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার কি ইচ্ছা, কে জানে!!

প্রকৃত ধর্ম্ম—চরিত্রে।

১

বিশ্বনাথ কর্ম্মকার পরম বৈষ্ণব। বাঙ্গালায় পরম ভক্ত বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। কোন প্রকার সাংসারিক কাজ করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করেন। হরিনাম কীর্ত্তন মনন, ধ্যান ধারণা, পূজা অর্চ্চনায় তিনি অধিক সময় ব্যাপৃত থাকেন। হরিনামে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হয়, কীর্ত্তনের সময় তাঁহার গগনভেদী "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনিতে সকলের প্রাণ উড়িয়া যায়; নাম-কীর্ত্তন শুনিবামাত্র কখনও অচেতন হইয়া পড়েন, কখনও নব নব হাবভাব প্রকটিত করিয়া সকলকে চমকিত করেন। অবশ্য এ সকল তাঁহার ইচ্ছাকৃত নয়। ভাবোচ্ছ্বাসের সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার একটীও বাদ পড়ে না। তিনি সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া এখন ভক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু, এদিকে, তিনি একটী একটী করিয়া চারিটী বৈষ্ণবীর ঘর করিয়াছেন। টাকা ধার করিয়া পরিশোধ করা কখনও তাঁহার স্বভাব ছিল না, আজও নাই। পরের উপকার করাকে কুসংস্কার মনে করেন। আত্মীয় স্বজনের সেবা করা নিতান্ত অবৈধ বোধেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। হরিনামের মালা সব সময়ে হাতে,ধর্ম্মজগতের বড় বড় কথা সর্ব্বদাই মুখে মুখে। তবে একটু ক্রোধ, একটু লোভ, একটু অহঙ্কার, একটু পরশ্রীকাতরতা, একটু পরনিন্দার ভাব সময়ে

সময়ে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তিনি মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এবং বলেন,আর সব লোক পাপী। ইহাও গণনার যোগ্য নহে, কেননা তিনি যে ধার্ম্মিক! তিনি পরম ভক্ত বলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রশংসিত। বৈষ্ণব মহলে বিশ্বনাথের গৌরবের সীমা নাই।

২

দীন মণ্ডল একজন দরিদ্র কৃষিজীবী। ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না—লেখা পড়া মোটেই জানে না। কিন্তু কথা বলিবার সময় তার মুখ হইতে যেন অমৃত বর্ষিত হয়। বিনয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ মাখা। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সে এক-জনের তিনটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ না করিতে পারিয়া সে সদা বিমর্ষ। মনে হয়, যেন পৃথিবীতে তাহার সুখ নাই। কোন দিন তাহার মুখে কেহ মিথ্যা কথা শুনে নাই। দরিদ্র দীন মণ্ডল নিজের ছেলে মেয়ে কয়টী লইয়া দুঃখে দিন কাটায়,কিন্তু জমীদারের খাজানা কখনও বাকী রাখে না, কখনও মামলা মকদ্দমা করে না। কোন লোকের পীড়ার কথা শুনিলে দীন মণ্ডল সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। কাহারও ঘরে আহারের জিনিস নাই শুনিলে অমনি ছুটিয়া দীননাথ সেখানে যায়। দীননাথ বড় বেশী কথা বলে না, কিন্তু কাহারও অভাবের কথা শুনিলে সে ঠিক থাকিতে পারে না; প্রাণপণে খাটিয়া অভাব দূর করে। যেরূপে হউক, অন্যের অভাব সে ঘুচাইবেই। অন্যের অভাব দূর করিতে সে সর্ব্বস্বান্ত হই-য়াছে, কিন্তু তবুও তাহার নিরানন্দ নাই। দুঃখ কেবল ঐ ৩টী টাকা পরি-শোধ হয় নাই। যাহার নিকট সে ঋণী, তাহার সংবাদ পাওয়া যায় না, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। দীন মণ্ডল বাঙ্গালার কোন দরিদ্র পল্লীতে অজ্ঞাতভাবে দিন কাটাইতেছে। দীনমণ্ডল দুঃখীর সন্তান, কাহারও প্রশংসা চায় না;—নিন্দাতেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

৩

দীনমণ্ডলের জমীদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, খুব দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। প্রতাপচন্দ্র ধনীর পোষ্যপুত্র; বাল্যকালে হরিহরপুরের জমীদার অপুত্রক অব-স্থায় তাঁহাকে ১০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন। প্রতাপের লেখা পড়ায় কখনও মতি ছিল না, অতি অল্প বড় লোকের ছেলেরই লেখা পড়ায় মতি দেখা যায়। সংসর্গ দোষে বাল্যকাল হইতে প্রতাপ চরিত্র দোষে দূষিত। প্রতিপালক পিতার মৃত্যুর পর অতুল সম্পত্তি তাহার হাতে পড়িয়াছে অবধি চতুর্দ্দিক্

হইতে বহু বন্ধু জুটিয়া প্রতাপচন্দ্রকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। অবৈতনিক উপদেষ্টা বা খোসামুদে-বহুল দেশে ধনী লোকের বন্ধুর অভাব নাই। এমন জঘন্য কাজ নাই, যাহা ইহারা করিতে পারে না বা করে নাই। প্রজার ঘরের সুন্দরী মেয়ে অপহরণ করা ইহাদের দৈনিক কার্য্য, অবস্থাপন্ন প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা উদার ধর্ম্ম। দীন মণ্ডলের মত প্রজাকেও এজন্য অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। দীনমণ্ডল জমীদারকে উপাস্য দেবতা এবং পিতার ন্যায় জ্ঞান করে, বহু বার অত্যাচারিত হইয়াও কোন কথা বলে নাই। আজ কাল প্রতাপচন্দ্র নাম কিনিবার জন্য কিছু প্রয়াসী হইয়াছেন—এ জন্য হাজার হাজার টাকা বড় বড় সভা সমিতিতে বা গবর্ণমেণ্টের কাজে দিতেছেন। বাহিরে প্রতাপের খুব নাম বাহির হইয়াছে। দয়ার অবতার বলিয়া সংবাদ পত্রে তিনি ঘোষিত হইতেছেন। দুঃখী দরিদ্রের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, প্রতাপচন্দ্র নাচ, বল প্রভৃতিতে আজ অকাতরে দান করিতেছেন; এবং সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঘরের লোকেরা, গ্রামের লোকেরা, দেশের লোকেরা প্রতাপকে পূর্ব্বের ন্যায়ই দেখে। কেননা, অভাবে পড়িয়া কোন ব্যক্তি প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইলে একটী পয়সা সাহায্য পায় না। দরিদ্র তাঁহার গৃহদ্বারে অনাহারে মরিলেও এক মুষ্টি ভিক্ষা পায় না। চরিত্র পূর্ব্ববৎ। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতাপ আজ কাল টাকার জোরে, বাহিরে বড় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।

৪

হরষিত চন্দ্র সেন এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁহার বড় প্রতিভা। তিনি তর্কে বা লেখায় জয় না করিয়াছেন, এমন লোক নাই। তিনি যাহার বিরুদ্ধে লাগেন, তাহারই সর্ব্বনাশ। তাঁহার বড়ই অহঙ্কার, তাঁহার সমতুল্য লোক এ ভূ-ভারতে নাই। কোন ভিক্ষুক তাঁহার বাড়ীতে এক মুষ্টি ভিক্ষা পায় না। কোন অতিথি এক দিন তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পায় না। টাকার লোভে বা প্রশংসার লালসায় একই বিষয়ে দশ জায়গায় দশ প্রকার মত দিতে পারেন, দিয়াও থাকেন,তাহাতে লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। দিবসে নহে,রাত্রে, উইলসনের বাড়ীর খানার সহিত একটু একটু মদ্যপান করেন। রাত্রে কখনও বাড়ীতে থাকেন না; এজন্য গৃহিণী বড় ক্রোধ করেন; কিন্তু বাহিরে এজন্য প্রশংসার হ্রাস নাই। বার মাসে তের পার্ব্বণ রীতিমত করিয়া থাকেন। লোকরঞ্জনার্থ মিথ্যা কথা বলা বা পর-উপকারার্থ ঘুষ দেওয়া বা গ্রহণ করাকে বড়লোকের

কাজ মনে করেন। কিন্তু তবুও লোকেরা বলে, হরষিত চন্দ্র একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

পরে পরে আমরা চারি জন লোকের কথা বলিলাম। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, এই চারি জন লোক চারি শ্রেণীর মুখপাত্র। সমাজ এই চারি শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পূর্ণ গর্ভ। এই চারি শ্রেণীর লোকের মধ্যে কে প্রকৃত মনুষ্য বা কে প্রকৃত ধার্ম্মিক? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ কাল বড়ই কঠিন। আজ কাল দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ হাল্‌কা বায়ু প্রবাহিত হইতেছে যে, সর্ব্ব দোষে দূষিত এবং সর্ব্ব-সৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াও বাহ্য চটকে লোক ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম বাহিরের ব্যাপার নহে, ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস। ধর্ম্মের জ্যোতিঃ জীবনে প্রতিফলিত হইলেই চরিত্র উৎপন্ন হয়। চরিত্র মানবপুরে দেবশক্তি—অথবা চরিত্র মানবে ঈশ্বরত্ব। এই চরিত্রের আদর দিন দিন এ দেশে লোপ পাইতেছে, স্বেচ্ছাচারিতায় ধর্ম্মনীতি শিথিল হইতেছে, ঝুটামাল আদরে বিকাইতেছে, মহা মহা ধর্ম্মরথীদিগের ব্যবহারিক জীবনের কদর্য্যতায় মানুষ ভাব-প্রবণতাকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইতেছে। কোন্ সময় হইতে, কি রূপে যে এই ভাব এ দেশে সংক্রামিত হইল, নির্ণয় করা বড় কঠিন। আমাদের বোধ হয়, সংসারাসক্তির উপর বৈরাগ্যের আধিপত্য সংস্থাপনে মহামতি শ্রীচৈতন্য একান্ত অন্তরে যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-প্রক্রিয়ার (Reaction) ফলে বৈষ্ণব সমাজ, দুর্নীতি-আসক্তির পূতিগন্ধময় পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, ধর্ম্ম ও চরিত্রশূন্য ধর্ম্মভাব এদেশে প্রচারে বা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব সমাজের নীতি-শিথিলতা বঙ্গ দেশে সংক্রামিত হইয়াছে। সকলেই এখন ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করে, অনেকেই বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান লোক দিন দিন বিরল হইতেছে।

সম্প্রতি বিদেশীয় কোন বক্তা এক দিন বাঙ্গালী চরিত্র ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—"Bengalis are very emotional—they are very fond of weeping and crying." বাস্তবিক বৈষ্ণব-ভাব-প্রাবল্যে বঙ্গপ্রদেশ ভাবরাজ্যের দাস হইয়া পড়িয়াছে। এখন সর্ব্বত্র ভাব-সাধন, ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া প্রশংসিত হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্যরাজ্যে অতি অল্প লোক প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, অধিকাংশ লোকই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ, চরিত্র-শূন্য ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি,—দয়া ধর্ম্ম, ব্রত

সংযম,প্রেম পুণ্য, এখন দিন দিন একটা বাহিরের উপকরণের ন্যায় উপেক্ষার জিনিস হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মগৈরিক বসনে,নিরামিষ আহারে,প্রাণশূন্য অনুষ্ঠানে, চক্ষের জলে, উচ্চ ক্রন্দনে, অযৌক্তিক মহাপুরুষ-পূজায়। ইন্দ্রিয়াদি দমনরূপ ব্রত-সংযম-নিষ্ঠা, সদাচার, বিনয়, নিরহঙ্কার ভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, অন্তর দৃষ্টি, যশ-নিন্দা-নিরপেক্ষতা এখন আর বড় একটা ধার্ম্মিকতার লক্ষণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় না। এক জন লোক যা তা কদর্য্য কার্য্য করিয়াও মুখে হরিনাম ও গায়ে বিভূতি মাখিয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া সকলের মন হরণ করিতে পারে। দেখিতেছি, চরিত্রের আদর দিন দিন এই বঙ্গভূমিতে হ্রাস হইতেছে। ধনীর আদর, বিদ্বানের আদর, বা আর যাহা হউক,এই সবই আছে,কিন্তু প্রকৃত চরিত্রের আদর এই হতভাগ্যদেশে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। চরিত্রের আদর এ দেশে থাকিলে, হরষিত সেনের ন্যায় লোক এ দেশে সম্মান পাইত না, বা বিশ্বনাথ কর্ম্মকারও পূজা পাইত না; এবং প্রতাপচন্দ্র সর্ব্বত্র নিন্দিত হইতেন। এদেশের বড় বড় বিদ্বান্ দেখিয়াছি, এদেশের বড় বড় ধনী দেখিয়াছি—এমন কি, বড় বড় ধার্ম্মিকও দেখিয়াছি,—মিথ্যা কথা বলিতে, প্রতারণা করিতে, কথা বলিয়া কথা প্রত্যাহার করিতে, একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে দেখি নাই,এমন লোক বড়ই বিরল। আমি,তুমি, সে—যার দিকে তাকাই,সকলেই এক দশাগ্রস্ত। হায়,উজ্জ্বল চরিত্রের আদর্শ মোটেই দেখি না! পাওনাদার বারম্বার আসিতেছে,বারম্বার সময়ান্তরে আসিতে বলিতেছে,কিন্তু একবারও কথা থাকিতেছে না। সমাজের খাতির রাখিতে যাইয়া সামান্য সামান্য ব্যাপারে মিথ্যা বলিতে একটুও উৎকণ্ঠা নাই। দুটী চারিটী পয়সায় লোভ সম্বরণ করিতে এখন আমরা হতজ্ঞান হইয়া পড়িতেছি। লোকের প্রশংসার খাতিরে কতবার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া কর্ত্তব্য ভুলিতেছি। সৎ সাহস নামক পদার্থটা এখন এদেশে কল্পনার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহার দেখিয়াও কেহ তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পায় না; সব যেন মৃত। অন্নাভাবে কত লোক হাহাকার করিতেছে, কতলোক জমীদারের অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতেছে, কতলোক অনাহারে মরিতেছে—কত বিধবার উষ্ণ অশ্রু মৃত্তিকায় পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—কত ভাই ম্যালেরিয়া-পীড়নে জর্জ্জরিত; হায়, সৎ ইচ্ছা বা সাহসের অভাবে—একবারও কেহ সে দিকে চাহিতেছে না! কার্য্যশূন্য লম্বা লম্বা প্রস্তাব মাথায় বহি, এবং হরিনাম উচ্চারণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসি,সকল সৎকাজের ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ

করিয়া, অলস দলে, বৈরাগীর দলে নাম লেখাইয়া ধার্ম্মিক চূড়ামণি হই। দেশে রাশি রাশি অভাব, কিন্তু আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই! ঘরে, বাহিরে—হাটে বাজারে—সর্ব্বত্র অভাব-সাগরের ঢেউ খেলিতেছে দেখিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত, উদাসীন। আমারও প্রাণ নাই, চরিত্র নাই—যাঁহাদিগকে আদর্শ মনে করিয়া অগ্রসর হই, দেখি, তাঁহাদেরও প্রাণ নাই, চরিত্র নাই। একটী লোকের চরিত্র-আদর্শ থাকিলেও এদেশ সেই আদর্শে জাগিত। মহা কপটতা বা প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা পাইত।

চরিত্র জিনিসটা কি? চরিত্র, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব,—বীরের বীরত্ব,—পুরুষের বীর্য্য, রমণীর সতীত্ব। চরিত্র, পশুত্বে দেবত্ব; চরিত্র, নরকে স্বর্গ। স্বর্গের প্রেম ও পুণ্য, মর্ত্ত্যের নীতি ও কর্ম্ম চরিত্রে সম্মিলিত। প্রেম ও পুণ্য যখন আয়ত্ত, তখনই চরিত্র; নীতি ও কর্ম্ম যখন প্রতিপালিত, তখনই চরিত্র। সংযমরূপ কঠোর তপস্যায় রিপুচাঞ্চল্য বা সংসারাসক্তি যখন নির্ব্বাণ লাভ করে, তখন যে ধর্ম্মের উদয় হয়, সেই ধর্ম্মই চরিত্র। সেই ধর্ম্মের কথাই বলিতেছি, যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে বা লোকমুখে নিবদ্ধ নহে, কিন্তু বিধাতার আদেশে বা অনুপ্রাণনে যাহা মনুষ্যে অবতীর্ণ। অর্থাৎ যাহা প্রতিজনের মধ্যেই স্বতন্ত্র। আর সেই নীতির কথাই বলিতেছি, যাহা মানব শাস্ত্রে বা কথায় সমাপ্ত নহে, কিন্তু মানব-চরিত্রে নিত্য নব শোভায় নবভাবে প্রতিফলিত। এই ধর্ম্ম ও এই নীতি যখন জীবন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত, তখনই চরিত্রের উৎপত্তি। তাহা বাহিরের উচ্ছ্বাস নহে, তাহা বাহিরের আড়ম্বর নহে। তাহা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে দেবশক্তি। তাহাই নরপুরে ঐশি শক্তি। ঈশা বুদ্ধ, নানক চৈতন্য, মুশা মহম্মদ, ম্যাট্সিনি পার্কার, কেশবচন্দ্র গ্লাডোষ্টোন, মুর বুথ এই চরিত্ররূপী ঐশিশক্তি। ইঁহাদের তেজে জগৎ বিকম্পিত। এই চরিত্রের অভাবে অজেয় নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনায় বন্দী, দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত জুলিয়স সিজর বন্ধুর হস্তে নিহত, মহাপরাক্রমশালী পার্ণেল ও বুলেঞ্জা জীবন্মৃত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহা তেজীয়ান স্যার চারলস্ ডিল্কে ইংলণ্ডে, এবং বিসমার্ক জর্ম্মনীতে নিস্তেজ। এই চরিত্রশক্তিতে যিনি শক্তিমান, পৃথিবী তাঁহার করতলস্থ, স্বর্গ তাঁহার অন্তরস্থ। তিনি মানুষ হইয়াও দেবতা, তিনি সংসারী হইয়াও স্বর্গবাসী। যে ব্যক্তি বারমাস পাপের সেবা করে,—পাপ-সেবা, পাপ-ভোজন করিয়া যাহার অস্থি মাংস পরিপুষ্ট, পাপচিন্তা ও পাপ-মননে যে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত, ধর্ম্ম তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে, বেশ পরিধানে, কিন্তু অন্তর শক্তিহীন। সংসারের প্রলোভন-সংগ্রামে সে সদা পরাজিত।

ধর্ম্ম,জীবনে প্রতিপালিত হইলে চরিত্রের উৎপত্তি হয়, বলিয়াছি। এই চরিত্র গঠিত হইলে, বিশুদ্ধ প্রেম ও কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভাবরাজ্যে যাহা প্রেম, চরিত্ররাজ্যে তাহা পাপ। যেখানে চরিত্র আছে, সেখানে আত্মসংযম আছে, কথায় কথায় সেখান হইতে চক্ষের জল নির্গত হয় না, বাহিরের হা হুতাশ দীর্ঘনিশ্বাস নাই, কিন্তু গভীর অন্তররাজ্যে সমবেদনা আছে; এবং সেই সমবেদনা হইতে উৎপন্ন কার্য্য করিবার ইচ্ছা আছে। অথবা চরিত্র যেখানে আছে, সেইখানেই অন্যের দুঃখ অপনোদনে বাসনা আছে, চেষ্টা আছে। ধার্ম্মিক অলস ভাবে বসিয়া থাকেন, এ দৃষ্টান্ত এখনকার যুগে এদেশে দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে এ দৃষ্টান্ত দেখা যাইত না। ধার্ম্মিকের ন্যায় কর্ম্মশীল প্রেমিক যোগী এই ভারতে আর ছিল না। যা কিছু মানুষের কর্ত্তব্য, সমস্তই ধার্ম্মিকদিগকে সম্পন্ন করিতে হইত। সিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ চরিত্র-লাভ হইলেই সাধকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। শাক্য বা শঙ্কর, কবির বা শ্রীচৈতন্য, নানক বা রামানন্দ, সকলেই সিদ্ধি বা চরিত্র লাভের পর প্রেমা-বতার রূপ ধারণ করিয়া, ঐ দেখ, ভারতরাজ্যের মহাপ্রচাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। চরিত্রবান্ সিদ্ধ ব্যক্তিরাই প্রকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রেমিক; এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই ধার্ম্মিক।

যাহা বলিবার, সংক্ষেপে বলিয়াছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার দিগন্তব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে, ইহাতে আমরা সুখী; কিন্তু যতদিন এদেশের নরনারীকে প্রকৃত চরিত্রলাভে যত্নবান হইতে না দেখিব, ততদিন কিছুই হইতেছে না, মনে করিব। যে দিন বিশ্বনাথ কর্ম্মকার, হরষিত চন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে দরিদ্র দীন মণ্ডলের ন্যায় কর্ম্মশীল সচ্চরিত্র ব্যক্তির আদর হইতে দেখিব, সেই দিন বুঝিব, কিছু হই-তেছে। চরিত্রহীনতায় ভারত ডুবিয়া গিয়াছে, যে মহাত্মা ভারতকে বহির্ম্মুখী ধার্ম্মিকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অন্তরমুখী ধর্ম্ম, চরিত্রধনে অধিকারী করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমাদের প্রণম্য। কবে সে দিন আসিবে, যে দিন এদেশের নরনারী প্রকৃত চরিত্রে অলঙ্কৃত হইয়া প্রেম এবং পুণ্য, জ্ঞান এবং কর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে; কবে আধ্যাত্মিক-তার স্বর্গীয় স্বাধীনতার প্রভাবে অহংজ্ঞান-সর্ব্বস্ব ভূমি পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে! বিধাতাই জানেন, কবে সে দিন আসিবে।

পরিণাম-চিন্তা।

এই বিচিত্র প্রকৃতির এবং প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের পরিণাম কি ? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন,সকলই অবিনশ্বর,—অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির উন্নতি হইতেছে,তৎসঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে মানব-দেহ-মনের সমূহ উন্নতি ঘটিতেছে। দার্শনিকগণ মানবাত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, মানুষ ক্রমেই পূর্ণত্বের (Perfection) দিকে চলিয়াছে ; অসভ্য মানুষ সুসভ্য হইতেছে,—ক্রমে সুসভ্য মানুষ দেবত্বে উন্নীত হইবে। এ সকল কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়ায় কোন ফল নাই, কেননা, বিজ্ঞান-প্রমুখ যুগের পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা জরা-মরণের অধীন,শোক দুঃখে,পাপ তাপে মুহ্যমান,আমরা বড় কথা জানি না,বড় কথা বুঝি না। সরল চক্ষে দেখিতেছি, সবই যেন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, সবই যেন পতন ও ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে। আমার অস্তিত্বেই আমার নিকট জগতের এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন। আমিই যদি চলিলাম, আমার সমাজের লোক সবই যদি ডুবিতে চলিল, তবে সমষ্টির উপর পৃথিবীর আর কার কি উন্নতি সম্ভব কি অসম্ভব,সে সকল ভাবিয়া আমার প্রয়োজন কি ? আমি যাহাকে প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব বলি, আমি যাহাকে মানবের মানবত্ব বলি,তাহা যেন পতন এবং মরণের পথেই চলিয়াছে। চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, ফুল নিঙড়াইয়া সুষমা, জল জমাইয়া শৈত্য, অগ্নি জ্বালিয়া উষ্ণতা, জল-অগ্নি মিলাইয়া যে বাষ্প পাওয়া যায়,তাহার মূলে কি ? তাহার মূলে এক অবিনাশী কার্য্যকরী চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। সেই শক্তি, প্রত্যক্ষবাদ বা জড়বাদের তর্কে দিন দিন প্রচ্ছন্ন, কুজ্ঝটিকাবৃত হইতেছে না কি ? এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এখন কেবল জড়ই স্বীকার করেন ; আর এক শ্রেণীর লোক, জড় উড়াইয়া কেবল মায়াই স্বীকার করেন। শঙ্কর এবং বার্কলীর মায়াবাদ বা চৈতন্যবাদই ঠিক হউক, বা চার্ব্বাক ও মিল-হক্সলির প্রত্যক্ষবাদ বা জড়বাদই ঠিক হউক, বিচার চাই না, বিচার করি না ; বলি কেবলি এই কথা, উভয় মতবাদের ভিতরেই যে সত্য লুক্কায়িত আছে, উভয় মতই যে আংশিক সত্য, এ কথা কোন পক্ষই কোন দিন মানিল না ; কোন দিন উভয় দলের মিলন সংঘটিত হইল না। মানিল না যে, এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতি প্রত্যক্ষ-

জড় এবং প্রত্যক্ষ-চৈতন্য-সংমিশ্রিত। সুতরাং পূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ জ্ঞান কই মানুষ পাইল? চির বৈপরিত্য ও চির বৈষম্যময় প্রকৃতি পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইলেন কই? যিনি পূর্ণরূপে আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃতই হইলেন না, তাঁহার পরিণামই বা কে বলিতে সক্ষম? বিজ্ঞান বলেন, চন্দ্র সূর্য্য কালে নিবিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পরিণতিতে কি হইবে, কেহ কি বলিতে পারেন? কল্পনা এবং থিওরি (theory)-বিমিশ্রিত কথা ছাড়িয়া বিচার করিলে, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতির পরিণাম বা পরিণতি সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এই প্রকৃতির বিবর্ত্তনে কি বিকৃতি ঘটিবে, কোন জড়বাদী বা কোন অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবাদী ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। উভয়ের যখন সম্মিলন হইবে, তখন বোধ করি, কতক সম্ভব হইতে পারে। এখন সে কথা আকাশকুসুমের ন্যায় কল্পনাময়।

প্রকৃতির পরিণাম যদি এইরূপ, মানবের পরিণাম তবে কি? মানব, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিরই ছায়া; সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, উহার পরিণামও ঐরূপ। সৃষ্টির মধ্যে, অতি পরিষ্কাররূপে, জড় ও চৈতন্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কেবল মানবে। মানুষে জড়ের লীলা আছে, চৈতন্যের খেলাও আছে। অথবা এখানে জড়-চৈতন্য মিশ্রিত আকারে পরিশোভিত। এখানে চৈতন্যের কাজ, চির-ভৃত্যের ন্যায়, জড়দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন করিতেছে। মস্তিষ্ক হুকুম করে, হাত পা কাজ করে। অথবা মন ইচ্ছা করে, ইন্দ্রিয় সকল তাহা পালন করে। কাম ক্রোধ ষড়রিপুর অধীন মানুষ, প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা, অবনত ভাবে, স্বীকার করিতেছে। এখানেই যেন পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব। এখানে আসক্তি বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আলোক আঁধার, ইহকাল পরকাল সব যেন প্রতিভাত। মানুষ যদি সম্যক প্রকারে মানবজ্ঞানে জ্ঞানী হইত, তবে, বুঝি বা, প্রকৃতির পরিণাম-সমস্যার সদুত্তর প্রদান করিতে পারিত। দুঃখের বিষয়, দেখিয়া শুনিয়াও মানুষ নিরেট বোকা, পড়িয়া ঘাঁটিয়াও মানুষ মহামূর্খ;—যেন কখন কিছু দেখে নাই, যেন কেহ কিছু শুনে নাই। কে না পরীক্ষায় দেখিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনায় শরীরের ক্ষতি হয়; কিন্তু কে তাহা হইতে বিরত থাকে? কে না শুনিয়াছে, অযথা রিপু-পরিচালনে মনুষ্যত্বের বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু কে তাহা মানিয়া চলে বা নিবৃত্তি সাধন করে? রিপুর সেবা, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে মানুষ সদা আত্মহারা; সেই জন্যই পরিণাম বুঝে না। আত্মজয়ী, মানব-জ্ঞানে জ্ঞানী, মনীষা-সম্পন্ন মহাত্মা-

গণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারেন, মানুষেরা কে কোন্ পথে যাইয়া কোন্ কূলে পৌছিবে? আমরা ইন্দ্রিয়াধীন, রিপুর অধীন, বারমাস আমরা জরা মরণ দেখিয়া বিকম্পিত, সশঙ্কিত, সংসার চিন্তায় বিজড়িত, তাই আমরা বলি, মৃত্যুই মানুষের পরিণাম। আত্মার অমরত্বে কাল্পনিক বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিলে, এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা মরণ ভিন্ন আর পরিণাম জানি না। যদি জানিতাম, এমন করিয়া মনুষ্যত্বের পথে কাঁটা পুঁতিতাম না।

ভাল মন্দ যদি মানুষ বুঝিতে না পারিত, কোন কথা ছিল না। মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ, উভয় বুদ্ধিই বর্ত্তমান। দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত মানব অন্তরে চলিতেছে। বিবেক বা বিধাতার আদেশ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও প্রেয় ও শ্রেয়ঃ এ-দুই জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। দেখিতেছি, দেবাসুর সংগ্রামে এখন আসুর বুদ্ধিরই জয় হইতেছে। দেখিতেছি, মানুষ শ্রেয়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পথেই ধাবিত। বুঝে না কে? মদ খাইলে শরীর নষ্ট হয়,কে না জানে? ব্যভিচার করিলে শরীর ও মানসিক-শক্তি দুর্ব্বল হয়, নানা ব্যাধি আক্রমণ করে, কে না বুঝে? তবুও মানুষ মজে কেন? ধন ঐশ্বর্য্য,বিষয় বৈভব সকলই ক্ষণস্থায়ী,কে না জানে,অথচ জীব অহঙ্কারে কেন মত্ত হয়? দু'দিন যে সুখ সম্পদ, তাহার জন্য মানুষ আত্মহারা হইয়া গর্ব্বে অন্ধ হয় কেন? অন্যের মহত্ত্ব স্মরণে মানুষ মহত্ত্ব পায়,কে না জানে, অথচ নিজের সহস্র দোষ উপেক্ষা করিয়াও,অন্যের দোষ আলোচনায়, মানুষ কেন সদা ব্যাপৃত? কারণ আর কিছুই নহে,—কারণ এই, দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরেরই প্রতিনিয়ত জয় হইতেছে। ইহাই প্রত্যক্ষবাদের বিশেষত্ব। "ঋণ করিয়া ঘি খাও" মতের জয় হইলেই, মানুষ ভিতর ভুলিয়া বাহিরে মজে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, আমাদের নানা হিত সাধনের সহিত, এই এক মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে যে, বহুদর্শী, যোগ-নিরত ভারতঋষিগণের সন্তানদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে, সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে স্থূল জ্ঞানে, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ভক্তির রাজ্য হইতে, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ-সম্ভোগে উপস্থিত করিতেছে। আগে ছিল সাধন ভজন, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা কাজ-কর্ম্ম-জগতে আমাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে! কেবল সাধন ভজন ভাল নহে, কেবল কাজ কর্ম্মও ভাল নহে। উভয়ের সংযোগ চাই। কিন্তু কোন দিনও কোন দেশে তাহা হইল না। কেহ সাধন ভজন করিয়া পৃথিবী খোয়াইল, পৃথিবীর শিক্ষা হারাইল; কেহ

বা সুখ সুখ, কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম, স্বর্গ, পুণ্য, নীতি ভুলিয়া কেবল পাপের পথে চলিল! মানুষ বুঝিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মানুষ বুঝিয়াও, বিষকে সুধা বলিয়া ভক্ষণ করিয়া মরিল! এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, মরিতে হইবে জানিয়াও, মানুষ, তাহা ভুলিয়া, পাপে মজিতেছে। যেন মরণের পথ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই জানে না!!

জড়বিজ্ঞান মরণের কথা বলিতে পারে, মরণের পর পারের কথা ঠিক বলিতে পারে না। মানুষ মরিবে ঠিক, কিন্তু তার পর? এইখানেই কি শেষ? এই জ্ঞানের অতীত আর কোন জ্ঞান কি নাই? জড়বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। মানুষ সেই জন্যই আত্মহারা, এই জন্যই অনেকের কথা এই, জীবন পাইয়াছি,এখন সুখ সম্ভোগ করিয়া মরি। মানুষ পতঙ্গ,আসক্তি-পিপাসা-আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। যে দিকে তাকাই, সবই যেন এই দশাগ্রস্ত। ক্ষণিক সুখের জন্য সকলে ব্যস্ত। উন্নতি বা পরিণাম চিন্তা নাই বলিলেই চলে। চার্ব্বাকের মতই ষোল আনা আধিপত্য করিতেছে। সর্ব্বনাশের আর বাকী কি? মানুষ যদি কেবল জড়দেহধারী হইত, শরীর ক্ষয়ে ব্যথিত হইতাম না। দেহের ভিতর যে চৈতন্যশক্তি, আত্মাই বল বা মনই বল, আছে, তাহার উৎকর্ষের জন্য আমরা কিছুই করিতেছি না। তাহার উৎকর্ষ, তাহার অনুশীলন ভিন্ন জীবের উদ্ধার নাই। তাহার উৎকর্ষের জন্যই রিপু, ইন্দ্রিয়, শরীর; তাহার জন্যই সুজলা সুফলা প্রকৃতিময় এই বিশ্বদ্যিালয়। আত্মিক জগতে যাইবার আয়োজন এই জড়দেহে রহিয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত, উদাসীন। কাজেই আমরা মরণকে দেহীর পরিণাম মনে করি। কাল্পনিক বিশ্বাসের বলে কেহ কেহ আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত আত্মজ বিশ্বাস নহে। সন্দেশ না খাইয়া, শুনা কথায় সন্দেশের মিষ্টত্ব স্বীকার করার ন্যায় ঐ স্বীকৃতি। উহাতে কোনই উপকার নাই। শুনা কথায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহা আত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান নহে। মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না পাইলে, প্রকৃত আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না। আত্মিক শক্তির উৎকর্ষসাধনহীনতাই এই অবিশ্বাসের মূল। এই অবিশ্বাস মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং মরণের অতীত জগতের কথা এখন কল্পনা-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। মানুষ, মৃত্যু উপস্থিত হইলে, এই জন্য, হাহাকার করে, অস্থির হয়, আবার দুদিন পরে তাহা ভুলিয়া আনন্দোৎসবে যোগ দিয়া রিপু-সংগ্রামে মাতে। মানুষ দিন দিন এত অসার হইয়া

যাইতেছে যে, আত্মিক জগতের কথা, চিন্ময় রাজ্যের কথা, এখন কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে। পুনর্জ্জন্ম সম্ভব কি না, পরকালে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকিবে, এ সব এখন মত-সঙ্কীর্ণতায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে; যাহা যাহার অন্ধ বিশ্বাস, তাহা কিছুতেই ছাড়ে না। নূতন কথা শুনিলেই ক্রোধ বা বিরক্তিতে আত্মহারা হয়। প্রকৃত জ্ঞান না থাকাই এরূপ হওয়ার কারণ। প্রকৃত চিন্ময় শক্তির জ্ঞান যতদিন উদয় না হইবে, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের কথা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিবে না। তত দিনই মানুষ, মৃত্যুকেই জীবনের শেষ মনে করিবে এবং মৃত্যুতে হাহাকার করিবে।

মনুষ্য যখন জড় ও চেতনের জ্ঞানে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে, তখন, জড়াতীত চৈতন্য এবং চৈতন্যাতীত জড়ের পরিণাম তাহার নিকট উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইবে; মরণের পর মানুষ কোথায় যাইবে, কি করিবে, তখন বুঝিবে। একবার বুঝিলে আর পৃথিবীকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে পাপে তাপে জড়িত হইয়া মরিবে না। কিন্তু সেই দিন কবে আসিবে, কে জানে?

বিবাহের উপদেশ। (১)

(১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১২৯৯।)

শ্রীমান্ * * * শ্রীমতী * * * তোমরা আজ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুদিগকে সাক্ষী করিয়া যে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা করিলে, ক্ষণকাল তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। তোমরা এত দিন এ পথে, সে পথে, একাকী, একাকিনী ভ্রমণ করিতেছিলে; আজ পরস্পরের জন্য ভাবিবে, পরস্পরকে ভালবাসিবে, এই ব্রত গ্রহণ করিলে। আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কৃপার কথা স্মরণ কর, যিনি এই বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে বিপদে তরণী, ঘোর ঝটিকায় আশ্রয়, রোগে ঔষধ হইয়া, এক কথায় সকল অবস্থায়, তোমাদিগকে কোলে করিয়া এত বড় করিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন, এক দিনও কি তোমরা বাঁচিতে পারিতে? তোমরা এখনও অল্প বয়স্ক, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহারই মধ্যে তোমারা কত বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া আজ এই সুখ-মিলনে উপস্থিত হইয়াছ। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার করুণা অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা না করিলে, কে আজ এস্থানে তোমাদিগকে দেখিত? পিতা বল, মাতা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, সকলের ভিতর তাঁহার স্নেহ, তাঁহার দয়া অহরহ

নীরবে বর্দ্ধিত হইয়া এই সংসার-মরুভূমিতে ওয়েসিস্ সৃজন করিতেছে। আজ বিশেষ ভাবে বিধাতার করুণা স্মরণ কর, এবং গদ গদ চিত্তে, ভক্তি-বিহ্বল হৃদয়ে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া আজ তাঁহাকে প্রণিপাত কর। তাঁহার করুণা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইলে তোমাদের জীবন মধুময় হইবে, তোমাদের জীবন সকলের আদর্শ হইবে।

তারপর ক্ষণকাল চিন্তা কর, আজ তোমরা কি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিলে। তোমরা অল্পবয়স্ক, সংসারের ভাল মন্দ হয় ত এখনও বিশেষরূপ জান না; কিন্তু আমার প্রাণ এ ব্রতের কথা শুনিয়া দুরু দুরু করিতেছে। "তোমর হৃদয় আমার হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হউক"—প্রেমের হাটে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় আর কি হইতে পারে? এক জনের হৃদয় অপরকে কে দিতে পারে?—যে ব্যক্তি আপনাকে ভুলিতে পারে। মনে কর, একটী টাকায় দশটী আম কেনা যায়; এই আম ক্রয়ের সময়ে টাকার মমতা ভুলিতে হয়, আমের মায়ায় মজিতে হয়। টাকার মমতা রাখিয়া, আমের মায়ায় কেহই মজিতে পারে না। জীবন বিনিময়ে যে জীবন কিনিতে চায়, তাহাকে জীবনের খাতিরে আপন জীবন ভুলিতে হয়। আপনাকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া কেহ অন্যকে ষোল আনা হৃদয়ে বাঁধিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। বিনিময়ের প্রথম কথা, টাকা ছাড় জিনিস লও,—আপনাকে ভুল, অন্যের জীবন গ্রহণ কর। হাটে বাজারে যে কথাটা অতি সহজ, প্রেমের বাজারে সে কথাটা বড় শক্ত। সচরাচর দেখি, মানুষ "অহং" রূপ ষোল আনা বজায় রাখিয়া অন্যকে আকর্ষণ করিতে চায়। ইহা কপট ব্যবসাদারী। প্রেমের বাজারে ক্রেতার এ লক্ষণে লোকসান বই লাভ নাই। আমার প্রথম কথা আজ এই, তোমরা আজ আপনাকে ভুলিয়া অন্যের প্রয়াসী হও। স্বামী, স্ত্রীর ভালবাসার জন্য, এবং স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসার জন্য, নিজ নিজ স্বার্থ আজ এই পবিত্র সময়ে পবিত্র দেবতার সমক্ষে বিসর্জ্জন দেও।

প্রেম স্বর্গ, প্রেম মুক্তি, এ কথা তোমরা শুনিয়া থাকিবে। ইহাও দেখিয়া থাকিবে, প্রেমে নরক, প্রেমে আসক্তি। একই জিনিস, বিভিন্নাবস্থায়, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক কেন,তা জান কি? প্রেমের লক্ষ্য যখন ঈশ্বর, তখন প্রেম স্বর্গ, প্রেম মুক্তি। প্রেমের লক্ষ্য যখন ইন্দ্রিয়-সেবা, তখন প্রেম আসক্তিময় নরক। তোমরা আজ উভয়ে পবিত্র প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, লক্ষ্য কি, আজ ঠিক করিয়া লও। তোমরা কি চাও? যদি ঈশ্বর তোমাদের লক্ষ্য

হন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই প্রেমে স্বর্গ ও মুক্তি মিলিবে। এই ভালবাসার পথ দিয়া অনন্ত প্রেমের বাজারে পৌঁছা যায়। জগন্মাতার কোলে আজ তোমরা দুটী প্রাণ মিলিত; কিন্তু যদি আত্মত্যাগ-ব্রতপালনে সমর্থ হইয়া এই প্রেমের পথে হাঁটিতে পার, অচিরে দেখিবে, এই পুণ্যময় প্রেম-ভাগীরথী তীরে শত সহস্র ভাই ভগ্নী সম্মিলিত। আমি বলি, পবিত্র ভাবে এক জনকেও যদি মানুষ ভালবাসিতে পারে, সত্যই স্বর্গ সেখানে অবতীর্ণ হয়। সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ, জ্বালা যন্ত্রণা, ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে না। মায়ের কোলের অনন্ত সন্তানবৃন্দকে দেখিয়া মানুষ মজিয়া যায়। তোমরা প্রেমের বাজারে যাত্রী হইলে, বিধাতার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই পথের সঙ্কীর্ণতা নামক জঞ্জালরাশিকে বিদূরিত করিয়া গভীর অনন্ত প্রেমধামে পৌঁছাইয়া দেন। বিবাহ করিয়া যাহারা সংসারের সঙ্কীর্ণতার বাজারে পদনিক্ষেপ করে, তাহাদের পক্ষে বিবাহ নরক ভোগ। এ কথা স্মরণ রাখিবে এবং উদার বিশ্বজনীন ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনন্ত প্রেমসিন্ধুর দিকে ছুটিবে। যে কাছে আসিবে, ভাই বলিয়া কোল দিবে। কেহ অনাহারে মরিতেছে দেখিলে, আপনার আহার দিয়া বাঁচাইবে; কেহ রোগে ভুগিতেছে দেখিলে, প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা করিবে। আমরা দরিদ্র, কিন্তু ইচ্ছায় আমরা দরিদ্র না থাকিলে, বিধাতার পুত্র কন্যার অনেক সেবা করিতে পারি। প্রেমশিক্ষার পথে প্রবেশ করিতেছ, অহঙ্কার ও ঘৃণা বিদ্বেষকে আজ বলি দেও। দু জন মিলিয়া যদি অনন্ত ভাই ভগ্নীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পার, তোমাদের ব্রত-গ্রহণ সার্থক হইবে, দেখিবে, প্রেমে স্বর্গ এবং প্রেমে মুক্তি। আর এ কথা যদি না শুন, অহঙ্কার ঘৃণা বিদ্বেষকে যদি পোষণ করিয়া চল, নিজেদের গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলিবে, সংসারে সেই অশান্তির অনল বিস্তৃত হইবে। আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেমের পথে যাওয়া যায় না, অহঙ্কারকে ভুলিতে না পারিলে জগতের হওয়া যায় না। যে জগতের না হইতে পারে, প্রেমব্রত গ্রহণ তার পক্ষে আসক্তি-নরকে যাইবার অবলম্বন মাত্র।

অহঙ্কার, ঘৃণা, বিদ্বেষ ভুলিতে পারা একদিকে বড় কঠিন, তা জানি। আবার আর একদিকে বড় সহজ। বিধাতাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, তবেই সাধন সহজ হইবে। তিনি, কেবল তিনি, সর্ব্বত্র। স্বামীতে তিনি, স্ত্রীতে তিনি—সকল ঘটে তিনি। বিশ্বাস করিবে, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তিনি জাগ্রত, জীবন্ত। স্ত্রী, স্বামীর মধ্যে স্বামীর স্বামী বিশ্বপতিকে দেখিবেন,

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সকল সতীত্বের খনি স্নেহরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিবেন। এখানে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। যে সংসারে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে না, সে সংসারে অনেক বিপদ। যে গৃহে স্ত্রীকে স্বামী পূজা করেন না, এবং যে গৃহে স্বামীকে স্ত্রী পূজা করেন না, সে গৃহে শান্তি থাকে না। সন্দেহ, অবিশ্বাস উদয় হইলে অহং জ্ঞান উপস্থিত হয়, ঘৃণা বিদ্বেষ হৃদয়ে ঘর বাঁধে। এ দুটীকে বিসর্জ্জন দিবে; এবং ক্ষমাকে সম্বল করিবে, নচেৎ এই পথ ধরিয়া মুক্তির রাজ্যে, শান্তিধামে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে।

আমি আজ, তোমাদিগের জীবনের এই বিশেষ দিনে, যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম,তাহা বলিয়াছি। শ্রীমতী* *, বাল্যকাল হইতে তোমাকে ভালবাসিয়াছি,—তোমার দুঃখে কত অশ্রু ফেলিয়াছি, তোমার সুখে কত আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তুমি জান। তোমার উপর আমার অনেক আশা ভরসা। তুমি বালিকা, কিন্তু আমি জানি, তুমি অনেক বুঝ। তোমার স্বামীর ভিতরে সর্ব্বদা বিধাতাকে দেখিবে। ইঁহার অনুগতা হইবে, কখনও ইঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে না, পূর্ণ বিশ্বাস করিবে। উভয়ে মিলিয়া প্রতিদিন বিধাতার পূজা করিবে, তিনিই তোমাদের অনুরাগকে সরস করিবেন। অনেক সময়ে অনেক কষ্টে পড়িবে, কিন্তু জানিও, সে অবস্থায় আমাদের আশা ভরসা কেবল ঈশ্বর। যত কষ্ট আসিবে, তাঁহাকে তত জোরে ধরিবে। রোগ শোকে, দুঃখ দারিদ্র্যে, তিনি ভিন্ন আমাদের আর কেহ আপনার নাই। এ কথা মনে রাখিবে, এবং খুব সাবধান হইয়া চলিবে। তোমাকে হয় ত অনেক অর্থ-কষ্টে পড়িতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি প্রার্থনাকে সম্বল করিতে পার, তোমাদের গৃহে কখনও অভাব ঠাঁই পাইবে না। স্বামীর পরিচর্য্যা সতীর প্রধান কাজ, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে করিবে, এবং অতিথি অভ্যাগতদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে সেবা করিবে। মনে রাখিবে সেবা ভিন্ন প্রেমের পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কখনও বিলাস-সুখকে জীবনের লক্ষ্য করিবে না। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া উপযুক্ত ব্রাহ্ম-ভার্য্যার কাজ সুসম্পন্ন করিয়া, কুললক্ষ্মী হইয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

শ্রীমান্ * * *, আজ এই দরিদ্র পরিবারের দরিদ্র কন্যার ভার তুমি লইলে, তোমাকে আর অধিক কি বলিব,বিধাতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। * * বালিকা, ভাল মন্দ কিছু জানে না, তুমি উপযুক্ত স্বামী, বুদ্ধিমান্ যুবক, তোমার প্রতি আমাদের অনেক আশা। আমার কথা কয়েকটী বন্ধুর উপ-

হার বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে এবং পূর্ণ বিশ্বাস ও ক্ষমা লইয়া * * স্নেহে প্রতিপালন করিবে। সংসারে কেবল পুষ্পশয্যা পাতা আছে, মনে করিও না; অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক দারিদ্র্য তোমাদিগকে পীড়ন করিবে। কিন্তু সব সময়ে, সকল অবস্থায় বিশ্বপিতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল করিবে। সকল কষ্ট দুঃখ এক দিকে, বিশ্বাস প্রার্থনা আর একদিকে। প্রার্থনা-বলে সকল কষ্ট সকল দুঃখ চলিয়া যায়। বিশ্বাস প্রার্থনার আয়ত্তাধীন যে কি নয়, আমি জানি না। বিধাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই প্রেমের পথে বিশ্বাস ও প্রার্থনাকে তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া তিনি তোমাদিগকে উন্নতির পথে হাত ধরিয়া লইয়া যাউন।

বিবাহের উপদেশ। (২)

১৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১২৯৯।

শ্রীমান্ * *, শ্রীমতী * *, তোমরা আজ পবিত্র পরমেশ্বরের এবং সমাগত আত্মীয় বন্ধুগণের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া নূতন জীবন-পথে পদার্পণ করিতেছ। এতদিন একভাবে তোমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, আজ চাহিয়া দেখ, তোমাদের জীবনের আর এক উৎস খুলিয়া যাইতেছে। তোমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পরস্পরকে জানিতে না, চিনিতে না—আর আজ উভয়ে উভয়ের জীবনসঙ্গী হইলে। বিধাতা কাহাকে কোন্ সূত্রে কোথায় মিলিত করেন, ভাবিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। মনুষ্যের বুদ্ধি যেখানে পৌঁছে না, বিধাতা সেখানে কত সুমঙ্গল রক্ষা করেন, কে জানে? আমরা সে পথে পা ফেলিবার সময় কত চিন্তা করি, বিধাতা সময়ে সময়ে আমাদিগকে হাতে ধরিয়া, সেই পথে লইয়া গিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করেন। তোমাদের এই শুভমিলনের মধ্যে বিধাতার কি মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, বিধাতা যখন নিজে এই শুভ সম্মিলন করিতেছেন, তখন ইহার মধ্যে তাঁহার অতি নিগূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে। তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া আজ তোমাদের উভয়ের হৃদয়ের সন্দেহ, মনোমালিন্য, অপ্রসন্নতা এই পবিত্র সময়ে বিসর্জ্জন দেও এবং এক প্রাণে, এক মনে, উভয় উভয়কে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম-সূত্রে বাঁধ।

প্রেমের কথা বলিয়াছি ত আর একটী কথা। ভালবাসার প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান কথা, পরস্পরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং নিজ নিজ স্বার্থ-বিসর্জ্জন। আজ তোমাদের পরস্পরের অতীত জীবনের সমস্ত অপরাধ ক্রুটী বিস্মৃত হও, আজই যেন তোমাদের জীবনের প্রথম দিন, এইরূপ ভাবিয়া, উভয়ে উভয়ের মধ্যে প্রেমময় বিশ্বপিতার প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন কর। সংসারের সুখ-স্পৃহা, সংসারের স্বার্থ-চিন্তা আজ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরকে পূর্ণ বিশ্বাস কর; অথবা ভাব, তোমাদের উভয়ের জীবন মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে; ভাব জীবনপথে উভয়েরই প্রয়োজন। আজ খোলা প্রাণে উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া পূর্ণাবয়বে পিতার সংসারে পদ নিক্ষেপ কর। দুই মিলিয়া যদি এক হইতে পার, কালে তোমরা শত শত ভাই ভগিনীকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবে। বিধাতা তোমাদের একীকরণের সহায়, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আজ সংসারে পদনিক্ষেপ কর।

বিবাহ করিয়া লোক সুখী হয়, বিবাহ করিয়া লোক কষ্ট যন্ত্রণাও পায়। এ পথে যাইবার সময় সকলেই উল্লসিত হয়, কিন্তু শেষে অনেককে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে, কোন দম্পতীই সুখী হইতে পারেন না। সর্ব্বদা এই কথাটী তোমরা স্মরণ রাখিবে, এবং পরস্পরের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, উভয়ে মিলিত হইয়া বিধাতার পূজা করিবে, এবং নিজ নিজ ক্রুটীর কথাই ভাবিবে, অন্যকে নির্দ্দোষী মনে করিবে। নিজের দোষ ক্রুটী মানুষ সব সময়ে দেখিতে পায় না, এই জন্য পৃথিবী অশান্তির আকর। অন্যের মহত্ত্ব স্মরণে মানুষের মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয়, এবং নিজ ক্রুটী দোষ স্মরণে মানুষ অভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু বিশেষ সাধনা ভিন্ন অন্যের মহত্ত্ব এবং নিজ ক্রুটী দেখিতে কেহই সক্ষম হয় না। অতএব কঠোর সাধনা করিবে, যাহাতে এই ব্রত পালন করিতে পার। পুণ্যময়ী সীতা, রামচন্দ্রের কোন দোষই দেখিতেন না; নির্ব্বাসিতা হইয়াও প্রার্থনা করিতেন,"রামচন্দ্রকেই যেন জন্মে জন্মে পতি পাই।" পুরুষের জীবনের এরূপ কোথাও উদাহরণ পাঠ করি নাই, কিন্তু এদেশের এবং সর্ব্বদেশের পুরুষ, রমণীর প্রতি কিছু অধিক সন্দেহযুক্ত বলিয়াই বুঝি বা, এরূপ দৃষ্টান্ত পুরুষ-জীবনে দেখা যায় না। তোমরা উভয়ে সীতার এই স্বর্গীয়ভাব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে এবং স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর এবং স্ত্রী ভিন্ন স্বামীর একদিনও যে চলে না,ইহা স্মরণ রাখিয়া পরস্পরের

ত্রুটি ও দোষের প্রতি উপেক্ষা করিবে, এবং যদি বা কখনও পরস্পরের ব্যবহারে প্রাণে বেদনা উপস্থিত হয়, পরস্পরকে ক্ষমা করিবে। ক্ষমার ন্যায় আর মানুষের উৎকৃষ্ট ভূষণ নাই। তোমাদের আর কোন গুণ না থাকিলেও, যদি এই ক্ষমা-ভূষণে তোমরা ভূষিত হইতে পার, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, চির-শান্তি এবং চিরসুখের তোমরা অধিকারী হইবে।

বিবাহের উদ্দেশ্য কি, তোমরা হয় ত তাহা জান না। মনু, সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিজ মত সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি, শুন। পৃথিবীর আর সকল আশ্রমের লোক, সকল জীবজন্তু গৃহস্থাশ্রমে আশ্রয় পায়। গৃহী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, স্বার্থত্যাগী হইয়া, সকলকে প্রতিপালন করিবেন, এই জন্য গৃহস্থাশ্রমের সৃষ্টি। গৃহ, প্রেম-নিকেতন, গৃহ মাতৃভূমি, গৃহ পৃথিবীর জীবলীলার আদি এবং শেষ নির্ভর স্থল। শিশু ক্রোড়ে জগজ্জননী, মাতৃরূপে, গৃহে প্রতিষ্ঠিতা। মা এখানে সকলের জন্য অতুল স্নেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই উষ্ণ পৃথিবীতে, মানব-শিশুর একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান, এই গৃহ। তোমরা আজ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেছ, দেখ, ভাব, পুণ্যময়ী বিশ্বজননী তোমাদের গৃহকে তাঁহার পুত্র কন্যার আশ্রয় দানের জন্য তোমাদিগের মস্তকে গুরুভার চাপাইয়া পাঠাইতেছেন। সন্তান পালন গৃহীর প্রধান কাজ, অতিথি অভ্যাগতদিগকে প্রতি-পালন করা গৃহীর উৎকৃষ্ট ভূষণ, জীবজন্তু পালন করা গৃহীর মহাব্রত। আজ হইতে তোমরা পূর্ণাঙ্গ হইলে; কিন্তু মনে রাখিবে, এই জগতের সহিত একাত্মক হইতে না পারিলে, তোমাদের গৃহস্থাশ্রম-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল হইবে। বিধাতার সকল পুত্র কন্যাকে প্রেম-নয়নে দেখিবে, তবেই, স্বর্গ হইতে তোমাদের গৃহে প্রেম-পুষ্প বর্ষিত হইবে।

তোমরা জান, দরিদ্র ব্রাহ্ম-সমাজ তোমাদের নিকট কত আশা করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তোমাদিগকে পাপ প্রলোভনের পথ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া কত যত্নে রক্ষা করিয়াছেন, তোমরা কখনও অকৃতজ্ঞের ন্যায় এই ধর্ম্মের কথা ভুলিবে না। আমরা বড় আশা করিয়া আজ তোমাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইতেছি, দেখিও, সংসারাসক্তিতে মজিয়া ব্রহ্মনাম ভুলিয়া যাইও না, ব্রাহ্ম-সমাজকে ভুলিও না। ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্মও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তোমাদের গৃহ অশান্তি, অপ্রেম, অধর্ম্ম ও পাপের লীলাক্ষেত্র হইবে। অতএব বিশেষ অনুরোধ, তোমরা আদর্শ ব্রাহ্ম-

পরিবারের ছবি দেখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে। বিধাতা তোমাদিগকে আজ আশীর্ব্বাদ করুন, তোমাদিগের সহায় হউন।

শ্রীমতী * *, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি সাধুশীলা, তুমি শান্তপ্রকৃতির অধিকারিণী, তুমি আমার সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ, আমি বুঝিতেছি। তোমার নিকট আমাদের অনেক আশা ভরসা। যাহা অন্যের জীবনে দেখি নাই, তাহা তোমার জীবনে দেখিব, আশা করিতেছি। আমাদের দেশের অনেক গৃহিণী গৃহস্থাশ্রমের গুরুতর কর্ত্তব্য ভুলিয়া স্বার্থ সাধনে রত থাকেন, আমার বিশ্বাস, তুমি কখনও সেরূপ করিবে না। অর্থ পাইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার যে করিতে না পারে, তাহার অর্থ পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। গৃহ পাইয়া যে গৃহের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারে,তাহার পক্ষে গৃহস্থ হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কোন জিনিস পাইবার পূর্ব্বে অনেক লোক যেরূপ লালায়িত হয়, দেখিয়াছি, দ্রব্য প্রাপ্তির পর আর সেরূপ ভাব থাকে না। তুমি উপযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বামী পাইলে, দেখিও, সর্ব্ব প্রযত্নে স্বামীর আদর, স্বামীর সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা যেন জীবনের ব্রত হয়। বিলাস-সুখের সেবা করিবার জন্য বিধাতা রমণী সৃজন করেন নাই। পৃথিবীর সন্তাপিত পুরুষের সহায় হইবার জন্য মাতৃমূর্ত্তির সৃষ্টি। স্বামীর সেবায় সিদ্ধ হইলে, তুমি জগতের সকলের সেবার অধিকারিণী হইতে পারিবে। প্রেমের রাজ্য,এইরূপে, উন্মুক্তদ্বার হয়। এত দিন পিতামাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসিতে, এখন তার উপর স্বামীকে ভালবাসিবে, স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসিবে, তারপর, যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, তুমি পুত্র কন্যার ভার পাইবে,—এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রেমের অনন্ত বিস্তৃত রাজ্যে অগ্রসর হইবে। স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিলে, স্বামীর স্বামী বিশ্বপতিকে চিনিতে পারিবে, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বপতির অনন্ত পরিবারের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ যোগ হইবে। তখন তুমি প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তি পাইবে। মানবজীবন কেবল পরিচর্য্যার জন্য, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। অহঙ্কার, বিলাসস্পৃহা, তোমার জীবনে কখনও দেখি নাই, সুতরাং তোমার এ পথে অগ্রসর হইবার আর কোন বাধা নাই। দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, দরিদ্র বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে, অপার ব্রহ্মকৃপার ছায়ায়, লালিত পালিত হইয়াছ, তোমার জীবন যদি সকলের আদর্শ হয়,আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

শ্রীমান্ * * *, তুমি দরিদ্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজ ব্রহ্ম কৃপায়

আদর্শ পরিবার গঠনের ভার লইলে; তোমার দায়িত্ব কতদূর গুরুতর, আজ এই বিশেষ দিনে একবার হৃদয়ঙ্গম কর। আদর্শ ব্রাহ্ম-পরিবার সংগঠিত না হইলে, আর এই দরিদ্র দেশের উদ্ধারের উপায় নাই। তুমি বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল যুবক, সকলই বুঝিতে পারিতেছ। তুমি যে উপযুক্ত ভার্য্যা পাইলে, একটু সাবধান হইয়া চলিলে,তুমি আদর্শ পরিবারের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবে, আমার বিশ্বাস। * * * আমাদের বড় আদরের পাত্রী, আজ তোমার হাতে ইহার ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতেছি। * * * র অন্তরে যে সকল স্বর্গীয় ভাব আছে, তোমার স্নেহ-সিঞ্চনে তাহা মুকুলিত হইবে, আমাদের বিশ্বাস। তুমি ক্ষমাশীল সাধুজীবনের আদর্শে * * * কে ধর্ম্মের উচ্চ রাজ্যে লইয়া যাইতে পারিবে, আমার আশা। সাবধান, তোমার দ্বারা আদর্শ ব্রাহ্ম-পরিবার সংগঠিত না হইলে, আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও।

আর একটী কথা তোমাকে নিতান্ত আত্মীয় বোধে বলিতেছি,মিতব্যয়িতা গৃহীর উৎকৃষ্ট ভূষণ। তোমাদের যে আয়, তাহাদ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে। মিতব্যয়িতা-শিক্ষার অভাবে অনেক ব্রাহ্মপরিবার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বদা একথা স্মরণ রাখিয়া চলিবে। সংসার পথে সব সময়ে সুখ মিলে না, মনে রাখিবে, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক তোমাদের জন্য অনেক কঠোর শয্যা রচনা করিতেছে। সকল অবস্থায় প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল করিবে। সম্পদে বিপদে, দুঃখ দারিদ্র্যে, অনন্যগতি হইয়া সর্ব্ব সময়ে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিবে। তিনি তোমাদিগের সকল অবস্থায় শান্তি প্রদান করিবেন। বিধাতা তোমাদিগকে আজ বিশেষ ভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

দুর্দ্দিনের বন্ধু।

পৃথিবীর বহুদর্শী লোকেরা বলিয়াছেন, বিপদ উপস্থিত না হইলে,কে বন্ধু, কে বা শত্রু, বুঝিবার উপায় নাই। কথাটা সকল দিক্ দিয়াই ঠিক। বিপদ যেমন বন্ধুত্বের পরিমাণ-যন্ত্র, এমন আর কিছুই নয়। স্বর্ণের খাটিত্ব যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় প্রকাশ হয়, বন্ধুর খাটিত্ব তেমনই বিপদ-পরীক্ষায় জানা যায়। বিপদে যে বন্ধু অটল, অচল, তিনিই ভালবাসার স্বর্গীয় প্রভায় প্রদীপ্ত—তিনি স্বার্থের অতীত ধামে, পরার্থপরতার বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত। তিনি পূজা পাইবার, প্রশংসা পাইবার সর্ব্বথা যোগ্য। কিন্তু সেরূপ বন্ধু এ পৃথিবীতে বড়ই বিরল।

হিতোপদেশ বলেন, রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে যে ব্যক্তি বন্ধু, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। রাজদ্বারে যখন মানুষ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়, সকলেই একে একে তখন পরিত্যাগ করে। শ্মশানে, অর্থাৎ মৃত্যুর দিনে, যখন সকলেই মায়া পরিত্যাগ করে, প্রকৃত বন্ধু কেবল নিকটে থাকেন। আর দুঃখ দারিদ্র্যে, এ পৃথিবীর প্রায় কোন লোকই দুঃখের অংশী হইতে চায় না। যে ব্যক্তি এ হেন অবস্থাতেও নিকটে থাকে, তাহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জানিবে।

বসন্তে কোকিল মধুর স্বরে ডাকে, শীতের দুর্দ্দিনে কোকিল নীরব। সম্পদ-বসন্তের মধুর বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তোমার চতুর্দ্দিকে সদানন্দে বিভোর তোষামোদপ্রিয় কত শত আত্মীয়কে ও বন্ধুকে কাছে পাইবে; কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ বিষম বিপদ যখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—দেখিবে, তখন এই পৃথিবীতে তুমি একা! কেহ কাছে নাই, কেহ আর তোমাকে দেখিবার নাই। সংসার-পরীক্ষায় পড়িয়া সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ সভার সম্মান রক্ষা করিতে পৃথিবীতে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, অনাহার-ক্লেশের ভাগী হইতে অতি অল্পই সুহৃদ্ মিলে। কেবল স্বার্থ, কেবল স্বার্থ, কেবল স্বার্থ দিয়া মানুষের আগাগোড়া গঠিত!! তুমি কাহাকে বল বন্ধুত্ব, কাহাকে বল ভালবাসা!!

কেবল ইহাই নহে। সম্পদের দিনে, ঐশ্বর্য্যের দিনে যে তোমার তোষামোদ করিবার অবসর পাইলে কৃতার্থ হইত, আজ তুমি বিপদে পড়িলে, সেই তোমাকে আঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিবে। প্রাণ দিয়া যাহার উপকার করিয়াছ, তোমার বিপদের দিনে সে তোমাকে আঘাত করিয়া উল্লাসে প্রত্যুপকার সাধন করিবে! দুধ কলা দিয়া পোষণ করিলেও, অবসর পাইলেই, বিষধর তোমাকে দংশন করিবে! কৃতজ্ঞতা, এ জগতে যেন স্বার্থ-সমুদ্রে বিসর্জ্জিত; পৃথিবীর মানুষ, অবসর পাইলেই তোমার বুকের রক্ত শোষণ করিবে। মানুষ! তুমি কাহাকে বল আত্মীয়, কাহাকে বল বন্ধু? শত্রুর তীক্ষ্ণ ছুরিকা এড়াইলে এড়াইতে পার, কিন্তু তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না কেন, বন্ধুর গুপ্ত শাণিত অস্ত্রের হাত এড়ান কখনই তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। খ্রীষ্ট যাহাদের জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেই জুডাস স্কেরিয়ট ছিলেন। সিজর যাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিতেন, তাহাদের মধ্যেই ব্রুটাস ছিলেন। পৃথিবী কলঙ্কের পণ্যবীথিকা, তুমি কাহাকে বল ভালবাসা, কাহাকে বল বন্ধুত্ব!!

ইতিহাসের বর্ণিত কথা ছাড়িয়া সংসারের ৪টী প্রত্যক্ষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেই।

যেরূপ চিত্র সর্ব্বদা দেখিতেছি,তাহার দৃষ্টান্ত দেই। মানুষ কেমন প্রতারক,বুঝিতে পারিবে। বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া মানুষ কিরূপ সর্ব্বনাশ করে, বুঝা যাইবে।

এক জন প্রবীণ ব্যক্তি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। ৪০০।৫০০ টাকা বেতন পাইতেন। সেই সময়ে কলিকাতার উকীল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, ডাক্তারগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মানিতেন; আদর করিতেন, সম্মান করিতেন, তাঁহাকে লইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেন। অথবা কি যে করিতেন না, জানি না। বড় বড় লোকের মুখে তাঁহার সদাশয়তা, প্রশংসা আর ধরিত না। ঘটনাক্রমে তিনি, সকলের উত্তেজনায়, চাকরি পরিত্যাগ করিলেন। সকলে তাহাকে বড় মানুষ করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু চাকরি পরিত্যাগের পর,ক্রমে ক্রমে,একে একে বন্ধুদের প্রফুল্ল বদনশোভা বিরল হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইল, আর কাহাকেও সে গৃহে দেখা যায় না। ক্রমে তাঁহার একটী পুত্রের মৃত্যু হইল, আর একটী পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে তাহারও জীবনের আশা নির্ব্বাণ হইল। তিনি এই ঘোর বিপদে এক ব্যক্তিকে এই সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কলিকাতার বড় বড় বন্ধু আমার কত ছিল, আমার সম্পদের দিনে তাঁহাদের গাড়ী আমার দরজায় ধরিত না, আর আজ এই দুর্দ্দিনে, দুঃখী ভাই, তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না; অবসর পাইলে তাঁহারা এখন আমার অনিষ্ট করিতে ছাড়েন না। কি আর বলিব, তোমাকে তখনও দেখিয়াছি, আজ এই দুর্দ্দিনেও দেখিতেছি, তুমি আমার পিতা,ভাই,বন্ধু,সকলই!" এই কথা বলিবার সময় প্রবীণ ব্যক্তির দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুপতিত হইতেছিল! যিনি এই হৃদয়-বিদারক দুঃখপূর্ণ বিলাপ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারও অশ্রু পতন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গল্পটী এই। এক ব্যক্তির একজন বন্ধু ছিল। নিজের অধীনে কাজ দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি পীড়িত হন। উপকারপ্রাপ্ত বন্ধু তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই—ক্রমাগত রোগীর জন্য খাটিতেছন, রোগীর মল মূত্র পর্য্যন্ত মুক্ত করিতেছেন! সে দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইল। রোগী যথাসময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। রোগীর অর্থসঙ্গতি প্রচুর ছিল। সময় পাইয়া, শুশ্রূষাকারী বন্ধু মৃতব্যক্তির ধন ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিবার জন্য, মৃতব্যক্তির বিধবাপত্নীকে আপনার করিয়া লইলেন। সকল আত্মীয়ের কথা তুচ্ছ করিয়া

অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিলেন। বুড়া বুড়ীর মিলনে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইল,লজ্জাশরম ভয়ে মাথা নোয়াইল! এ জগতে বিশ্বাসী বন্ধু কোথায় মিলে, ভাবিয়া নরনারী আকুল হইল!

তৃতীয় গল্পটী এই—এক সদাশয় ব্যক্তি এক জন মহাজনের নিকট হইতে ১০৲টী টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ঐ মহাজনের এক সময়ে অনেক উপকার করিয়াছিলেন। টাকা কড়ি দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন বলিলেও হয়। এই ব্যক্তি যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন মহাজন, ১০৲টী টাকা যায় দেখিয়া, এই ঘোর দুর্দ্দিনে, উপকারী বন্ধুর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ঐ টাকা চাহিলেন। বৃদ্ধ খাতক আসন্ন বিপদে আর উপায় নাই দেখিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন "অদৃষ্ট, তাই ঋণ লইয়া মরিলাম।" এই বিষাদের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কোন গৃহস্থ ব্যক্তি ১০৲টী টাকা ঐ আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পুত্রকে দিয়া বৃদ্ধকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন।

আর একটী গল্প এই। একব্যক্তি অবসর পাইলেই পরের উপকার করিতেন। অনেক লোককে অর্থসাহায্য করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখন কেহ কেহ খুব পসারশালী লোক হইয়াছেন। একব্যক্তিকে তিনি ১০০৲,২০০৲ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০০৲, ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া উপকার করিয়াছিলেন। এই টাকার জোরে তিনি বড় ব্যবসা চালাইতেছিলেন। এই উপকারী ব্যক্তি এক সময়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আরোগ্য না হওয়াতে শেষে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যান। এই সময়ে, হঠাৎ ঐ পশারশালী বন্ধু, কোন নিজ ইষ্ট সাধনের জন্য, একখানি উকীলের চিটী দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিলেন! উপকারী বন্ধু সংসারের গতি দেখিয়া অবাক্। এই সময়ে আর সকল বন্ধুর কথা আর ব্যক্ত করিয়া কাজ নাই। কেহ এই দারুণ বিপদের সময় হাসি উল্লাস করিতে লাগিলেন, কেহ সময় পাইয়া অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। যে সকল বন্ধুদিগকে আজীবন উপকার করিয়াছেন, ভ্রমেও তাঁহারা দেখিতে আসিলেন না—কেহ সময় বুঝিয়া ছলেচক্রে টাকা আদায় করিতে উদ্যোগী হইল, কেহ কোন্ স্থানে কোন্ কাজে ত্রুটী হইয়াছে, ছল ধরিয়া নির্যাতন করিতে লাগিল! দুই দশটী টাকা গচ্ছিত ছিল, কেহবা সে টাকা যায় বুঝিয়া, হিসাব চাহিতে লাগিল! কেহবা, সর্ব্বাবয়বে মূর্ত্তিমান হইয়া রক্ত শোষণে লালায়িত হইল! উপকার করিবার ভাণ করিয়া গরল বিষ পান করাইতে চেষ্টিত হইল!! রোগী দেখিয়া শুনিয়া অবাক্!

ঘটনাচক্রে পড়িলে মানুষ শিক্ষা পায়। একজন লোক একদিবস বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"অমুক লোক আপনার নিন্দা করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,"কই আমি তাহার কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই, সে কেন আমার নিন্দা করিল!" কাহারও উপকার করিলেই সে অপকার করিবে বা নিন্দা করিবে,বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথার শেষ সিদ্ধান্ত ইহা। এ সিদ্ধান্ত অতি কঠোর সিদ্ধান্ত। মানব-ঘৃণার ইহা অপেক্ষা উচ্চ দৃষ্টান্ত আর নাই। কিন্তু সংসারের অবস্থা পীড়নে প্রপীড়িত ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করেন, কৃতজ্ঞতা নামক স্বর্গীয় গুণটা মহা স্বার্থ-সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। বিশ্বাস করিবে কাহাকে, মানুষ স্বার্থপরতার কদর্য্য কালিমার চির আঁধারে মগ্ন!!

যদি কাহাকেও বিশ্বাস না করা যায়, তবে এই পৃথিবী কিরূপে বাসের যোগ্য হইবে? বিশ্বাস ভিন্ন এক দিন, এক মুহূর্ত্ত চলেনা, অথচ বহুদর্শী লোকেরা বলেন, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না; যে তোমাকে আজ সুখ-শয্যায় বীজন করিতেছে, কাল সেও তোমার বুকে ছুরী মারিতে পারে। ঘটনাতেও প্রতিনিয়ত, একথা প্রমাণিত হইতেছে। যাহার প্রশংসায় জগৎ প্লাবিত, তাহার দৈনিক জীবনের ব্যবহার, চতুর্দ্দিকের ঘটনারাশি পর্য্যালোচনা করিলে, আর কাহাকেও আদর করিতে ইচ্ছা হয় না। স্বার্থপরতার মায়ায় মানুষ না সাধন করিতে পারে, এমন কাজ নাই। এই স্বার্থদাস-মানুষের সহিতই প্রতিনিয়ত ঘরকন্না করিতে হইতেছে। বিশ্বাস না করিলে চলে কই? তুমি বিজ্ঞ, বাছিয়া বাছিয়া, কেবল লোক বাছিয়া বাছিয়া চলিতে বলিতেছ। আমি দেখিতেছি, বাছিতে বাছিতেই যদি সময় গেল, তবে কাজ করিব কখন? তুমি বল, স্ত্রীকে বিশ্বাস নাই, স্বামীকে নাই, ভাইকে নাই, বন্ধুকে নাই, পুত্রকে নাই, কন্যাকে নাই;—নাই, নাই, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি বল, যাহাকে দান করিবে,তাহাকেও বিশ্বাস নাই; যাহার উপকার করিবার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেছ, তাহাকেও বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস না থাকিলে এক মুহূর্ত্ত সংসার চলেনা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আমি লোক চিনি না,তুমি বিজ্ঞ,তুমি নিয়ত একথা বলিতেছ; তুমি চিনিয়া বুঝিয়া ত এখন কার্য্য-জগত হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া,কাহারও কিছু হইবে না, এই মানব-ঘৃণা (misanthropy) মন্ত্রকে জীবনের সার করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর সিদ্ধ-আসনে বসিয়া রহিয়াছ। তোমার কথা শুনিয়া চলিলে, এই সংসার-কার্য্যালয়ের পাট তুলিয়া

গহন বনে চলিয়া যাইতে হয়। ঠকিতেছি, ভাই, তবুও সংসার মায়া ছাড়িতে পারিতেছি না। দশবার প্রতারিত হইয়া, শতবার প্রতারিত হওয়ার জন্যই প্রস্তুত হইতেছি। আপন সৃষ্ট চক্রান্ত-কৌশলে আপনিই পড়িয়া মজিতেছি। আগুনে পড়িয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,—অন্যে শত চেষ্টা করিলেও তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। তুমিও, সেই রূপ, শত চেষ্টা করিয়াও, আমাকে বাঁচাইতে পারিতেছ না। শত উপদেশ, শত হিতকথা পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বহুদর্শিতাও বহুদর্শীর ন্যায় বুঝাইতেছে, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই; কিন্তু মায়া ছাড়িয়া, পরোপকার-ব্রত কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। আমি ত পারিলাম না, অন্যান্য সকলের মধ্যে সংসারমায়া ছাড়িতে পারিল কয় ব্যক্তি? মহামায়ার মহালীলা, মহাচক্রীর মহাচক্র। ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার কাহারও উপায় নাই।

ভালবাসা, মানুষের প্রকৃতি। ভাল না বাসিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি মানুষের মুখে প্রতিভাত, মানুষ, অগ্নি-প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় ঐ জ্যোতিতে প্রলুব্ধ। উহার সংস্পর্শে না যাইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। মানুষের সেবা করা, মানুষকে ভালবাসা মানুষের যেন স্বভাব। ভালবাসার মূলে বিশ্বাস। বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে মানুষ পারে না। মানুষের ভালবাসা যেন পতঙ্গের আগুন। ভালবাসার সৌন্দর্য্যে জগৎ আত্মহারা। মানুষ আর কোন স্থলে সংযম, অভ্যাস করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ভালবাসার কুহকে যখন মানুষ পড়ে ও মজে, তখন সংযম বৃথা, ব্রত, নিষ্ঠা সবই পরাস্ত। যে বন্ধু বুকে মারিবার জন্য ছুরী শাণিত করিতেছে, মানুষ তাহাকেই ভালবাসিয়া কোল দিবে; যে রমণী মানুষকে পুণ্যহারা করিয়া,কুপথের ঘোর মায়াজালে জড়িত করিয়া পাপে মজাইতে চেষ্টিতা, তাহাকেই মানুষ প্রাণ সঁপিয়া দিবে! মানুষ নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়,পুণ্য-মমতা ভুলিয়া যায়—ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন ভজন, উপদেশাদি সকলই ভালবাসার কুহকে ভুলিয়া যায়। ভালবাসার কুহকে মজে নাই, পৃথিবীতে এমন লোক বড় দেখা যায় না। মজিবার সময়, সকলের কথা, সকলের উপদেশকে মানুষ তুচ্ছ করে। সৎ অসৎ, সকল লোকই ভালবাসায় মজে। ভালবাসার কুহকে প্রতারিত, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, পার্কার। যাহারা আত্মীয়, তাহারাই সময়ান্তরে মহা অনিষ্টকারী সয়তান। এই সয়তানরূপী লোকের ভালবাসায় প্রতারিত কে নয়, জানি না। ভালবাসায় প্রতারিত গ্লাডষ্টোন, বিদ্যাসাগর—অপর

দিকে পার্ণেল, ডিকে, বুলেঞ্জার। ভাল যে, মহৎ যে, জ্ঞানী যে, মানবদেবতা যে, সেও প্রতারিত; মূর্খ যে, মন্দ যে, অসৎ যে, সেও প্রতারিত। মানব-সাধারণকে ডুবাইতে এমন জিনিস পৃথিবীতে আর নাই! অন্যদিকে মানুষকে স্বর্গে উত্থিত করিতেও এমন আর কিছু নাই। ভালবাসিয়া লোক স্বর্গে যায়—ভালবাসিয়া লোক নরকেও যায়! ভালবাসা, বলিহারি তোর মোহিনী-শক্তি! তোর কুহকে জগৎ মুগ্ধ, স্তম্ভিত, আত্মহারা !!

বিধাতার লীলা কেন এরূপ বিরোধী চক্রান্তে পূর্ণ, একথার মীমাংসা কেহই করিতে পারে না। কেন পাপ পুণ্যের অধিষ্ঠান, কেন পৃথিবীতে দেবাসুর-সংগ্রাম, কেহই বলিতে পারে না। বৈচিত্র্যের জটিল কথায় সকল সমস্যা মীমাংসিত হয় না। আলোকের ধারে অন্ধকার, পুণ্যের ধারে পাপ, সত্বের ধারে রজঃ, সুবুদ্ধির ধারে কুবুদ্ধি, শ্রেয়ের ধারে প্রেয়ঃ, কুসুমের ধারে কণ্টক, ঝরণার ধারে পাষাণ, সাগরের স্নিগ্ধ বারিতে লবণ, চাঁদে কলঙ্ক, সম্পদের ধারে বিপদ, স্বাস্থ্যের ধারে রোগ, সংসারের কোলে শ্মশান, জীবনের কোলে মৃত্যু, সুদিনের ধারে দুর্দ্দিন—এবিরোধী বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি কেন, কোন দার্শনিক, কোন বৈজ্ঞানিক আজ পর্য্যন্ত সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আধিব্যাধি, জরামরণ, পাপ-প্রলোভন কেন মানুষকে অস্থির করে। নিরঞ্জনা-তটে বহুবর্ষব্যাপী সাধনায়ও বুদ্ধ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, উত্তেজনা, বীর্য্য, সাহসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট মহম্মদও তরবারীর সাহায্যে ইহার মীসাংসা করিতে পারেন নাই। জ্ঞানীর জ্ঞান, দার্শনিকের দর্শন, ধার্ম্মিকের তপস্যা, কর্ম্মীর কৃতিত্ব—এই গভীর ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় সকল অকৃতকার্য্য!! কেন জগৎ এরূপ হইল, কেন প্রকৃতি কাঠিন্য-কোমলতায়, পাপ-পুণ্যে, ধর্ম্ম-অধর্ম্মে পূর্ণ হইল, কোথাও ইহার মীমাংসা নাই। আত্মার স্বাধীনতা প্রশ্নের মীমাংসায় ইহার মীমাংসা নাই, আত্মার পরাধীনতার কথাতেও ইহার মীমাংসা নাই। আত্মা স্বাধীন হউক আর পরাধীন হউক, কি আসিয়া যায়? বিধাতার রাজ্যে প্রতারণা কেন, পাপ কেন, অত্যাচার কেন, অন্ধকার কেন, অবিশ্বাস কেন? কেন, কে বলিতে পারে? অন্যদিকে লোক বুঝিয়াও ভুলে কেন, মজে কেন, পড়ে কেন, ডুবে কেন? কেন, কে বলিতে পারে? সকল শাস্ত্র এখানে নীরব। সকল শাস্ত্র, মহামায়ার মহাখেলা বলিয়া, নিরস্ত। তুমিও জান না, আমিও জানিনা—প্রকৃতি এরূপ কেন, মানুষই বা এরূপ কেন? মায়াবাদী না হইতে পারিলে বুঝি বা জগতে সুখ শান্তি কোথাও নাই !!

মায়াবাদীরা বলেন, সকলই খেলা। জড়, জড় নয়, মানুষ মানুষ নয়—সকলই নয়নের ধান্দা। অথবা বিশ্বের অন্তঃরালে যে শক্তি বিদ্যমান, তাহারই বুদ্‌বুদ, তাহারই প্রকাশ। শঙ্করই হউন, আর বার্কলীই হউন, হক্সলীই হউন, আর হিউমই হউন, যত তর্ক বিতর্ক করুন, জড়কে উড়াইতে কেহ সক্ষম নহেন; মায়াকে, অবিদ্যাকেও কেহ জগৎ হইতে তিরোহিত করিতে সমর্থ নহেন। জড় ও মায়া—একেরই কায়া, একেরই ছায়া। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সামঞ্জস্যেই এক চিন্ময় শক্তির প্রকাশ। সেই এক চিন্ময় শক্তি কোথায় কিরূপে আছেন, মানুষ তাহা জানে না। এইখানেই অজ্ঞেয়তাবাদের উদয়। মানুষের শক্তি নগণ্য, অতি সামান্য; মানুষ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝেনা। মানুষ একটী পরমাণুও বুঝে না, একটা অণুও ধারণা করিতে পারে না। এতই সামান্য জীব মানুষ! বুঝেনা বলিয়াই কি অণু-পরমাণু নাই? না, এ সিদ্ধান্ত হয় না। জগৎ আছে যখন, তখন স্রষ্টাও আছে। আমি তুমি জানি না বলিয়াই যে তিনি নাই, একথা প্রতিপন্ন হয় না। সৃষ্টি আছে, সৃষ্ট মানুষ কেহই ইহা অস্বীকার করেন না; সৃষ্টির পশ্চাতে যতদূর সম্ভব ধাবিত হও, আদি কারণে, কারণের কারণে যাইতে যাইতে আদি কারণে তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি মহাজ্ঞানী স্পেন্সারই হও, আর মহা তর্কী মিলই হও, আদি কারণে তোমাকে পৌঁছিতেই হইবে। অপর দিকে, জান না যাঁহাকে বলিতেছ, তাঁহার জন্য জগৎ ব্যতিব্যস্ত কেন, বলিতে পার কি? সৃষ্টির আদি হইতে সকল সভ্য এবং অসভ্য জাতি স্রষ্টার জন্য এত অশ্রু কেন ফেলিতেছে, উত্তর করিতে পার কি? আদিকারণকে মানুষ জানে না, তবুও মানুষ তাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগী। মানুষেরা ধর্ম্মের জন্য না করিয়াছে, এমন কাজ নাই। মন্দিরের ধারে মন্দির, গির্জ্জার ধারে গির্জ্জা, মস্‌জীদের ধারে মস্‌জীদ তুলিয়া মানুষ ধর্ম্মের জন্য কত অর্থই ঢালিয়াছে! অন্যদিকে ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িয়াছে, আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়াছে, সুখ বিলাস ভুলিয়াছে, শেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই যে এত কীর্ত্তি, ইহা কেন? এই যে এত আত্মত্যাগ—ইহা কেন? কোন অ-দৃষ্ট বস্তুর জন্য, কেবল মিথ্যা বা নিরেট শূন্যের জন্য, মানুষ এতটা করিতে পারে না। মানুষ কিছু দেখিয়াছে, তাই মজিয়াছে। মানুষ কোন সত্যের উপকূলে পৌঁছিয়াছে, তাই এরূপ করিয়া থাকে। দুঃখ কষ্ট মানুষ তাই সহ্য করিতেছে। কোন সত্য বস্তুর আস্বাদন না পাইলে, মানুষ, এমন করিয়া কেবল গরল পান করিবার জন্য সংসারে থাকিত না। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে দেখাইয়াছি, সংসারে কোন

সুখ, কোন শান্তি নাই। চতুর্দ্দিকে যখন কেবল স্বার্থ, কেবল অবিশ্বাস, তখন আর সুখ কোথায়? স্বার্থ-সাধনে সুখ নাই, কেবল পিপাসার বৃদ্ধি আছে; অবিশ্বাসে শান্তি নাই, কেবল মানব-ঘৃণার অসংযত অন্তর্দাহ আছে। এই মহাস্বার্থ-পূর্ণ, অবিশ্বাসপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ, অসুখপূর্ণ সংসাররাজ্যে কিসের মায়ায় মানুষ জীবন ধারণ করিতেছে? যে ব্যক্তি ভালবাসার কুহকে বারম্বার প্রতারিত হইতেছে, সেই ভালবাসাতেই আবার সে ব্যক্তি জড়িত হইতে ছুটিতেছে। একজন বন্ধু প্রতারণা করিয়া পলায়ন করিতে না করিতে, আর একজনকে মানুষ বুকে তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। একটী পুত্রকে শ্মশানে পোড়াইয়া আর একটী পুত্রের মুখ-দর্শনের জন্য উৎফুল্ল হইতেছে? কোন আশা, কোন পরিণাম-চিন্তা না থাকিলে মানুষ ভীষণ বিপদ-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসারের কূলে ঘর বাঁধিত না। জন্মিয়া, জ্ঞানলাভের পরই মরিত;—মৃত্যু আপনি না আসিলে আত্মহত্যা করিয়া মরিত। কি যেন একটা মহাজ্ঞান, মহাচিন্তা, মহালক্ষ্য মানুষের প্রাণে চিরমুদ্রিত, চিরজাগ্রত, চিরসহায় হইয়া আছে, যাহার জন্য মানুষ প্রতারিত হইয়াও এই সংসারে থাকিতেই ভালবাসে; অথবা যাহার প্রতিকূলে চলিতে মানুষের সাধ্য নাই। সেই জ্ঞান, সেই চিন্তা, সেই লক্ষ্য, ঈশ্বর;—অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয়, অমীমাংসিত, জটিল, অশেষ, অলিখিত সেই এক আদি শক্তি। মানুষ বিজ্ঞানে দর্শনে ঈশ্বরকে পায় না, সত্য; কিন্তু প্রাণের মূলে, তাঁহার স্পষ্ট আদেশে, তাঁহার বাণীতে তাঁহাকে পায়। তুমি যদি আমাকে বল, আছ কেন, এতবার প্রতারিত হইয়াও আছ কেন? আমি বলি, তাঁহারই ইচ্ছাতে আছি, দেখিয়াও যাঁহাকে দেখি না, পাইয়াও যাঁহাকে পাই না, বুঝিয়াও যাঁহাকে বুঝি না। তাঁহার জন্যই আছি, যিনি দেখা না দিয়াও আমাকে মাতাইতেছেন, যিনি অনন্ত অশেষ স্বরূপের বিন্দু আভাস দিয়াই আমাকে বাঁচাইতেছেন; যিনি প্রতি মুহূর্ত্ত প্রাণে কথা বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তিনি সুদিনেও বন্ধু, দুর্দ্দিনেও বন্ধু। তিনি স্বাস্থ্যেও বন্ধু, রোগেও বন্ধু। তিনি জীবনেও বন্ধু, তিনি মরণেও বন্ধু। প্রতারিত হই, নিন্দিত হই, নির্য্যিত হই, পাপী হই, পরিত্যক্ত হই,— সব হইয়াও যে থাকি, কেবল তাঁহারই কথায়, তাঁহারই মায়ায়। অদেখা-দর্শন, অচেনা-মিলন, অকথিত-রূপ ও সেই অলিখিত-সৌন্দর্য্যের জন্য আমার প্রাণ সদা বিভোর। আমি সংসার করি, তাঁহারই জন্য। তুমি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সকল বিশ্বাসীই তোমাকে এই রূপ উত্তর দিবে। দুর্দ্দিন, সুদিন, রোগ শোক, জীবন মরণ, আলোক আঁধার—

সব অবস্থাতেই তিনি। তিনি, তিনি,তিনি,—নিত্যই তিনি। রাখেন তিনি মারেনও তিনি, আমরা কেবল কলের পুতুল মাত্র। এই তন্ময় জ্ঞান লাভ না হইলে, এই বিপদপূর্ণ, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও এই প্রতারণাময় সংসার উপকূলে কেহই সুখে, কেহই আরামে, কেহই শান্তিতে তিষ্ঠিতে পারিত না।

শেষ সিদ্ধান্ত এই, মানুষের প্রতারণা, মানুষকে সতর্ক করিবার জন্য; বন্ধুর কৃতঘ্নতা,দুর্দ্দিনের প্রকৃত বন্ধুকে চিনিবার জন্য; মানুষের রোগ,মানুষকে স্বাস্থ্যের পথে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; পাপ প্রলোভন, মানুষকে ধর্ম্মে অটল করিবার জন্য; মৃত্যু,অনন্ত জীবনলাভের জন্য; অন্ধকার,মহাজ্যোতি দর্শনের জন্য। এই বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যপূর্ণ প্রকৃতি মানুষকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে, ভাল হইতে ভালতে, সৎ হইতে আরো সতে লইয়া যাইবার জন্য। এ সকল অবস্থা, ঘটনা, বৈচিত্র্য, উন্নতির সিঁড়ি মাত্র; যাত্রীদিগকে অগ্রসর করিবার জন্য। যাঁহারা এইরূপ অর্থ না বুঝিয়া চলেন, এবং প্রতিকূল-অনুকূল ঘটনা-নিরপেক্ষ হইয়া, সারকে চিনিয়া, সারধনকে অবলম্বন ও লক্ষ্য করিয়া না চলেন, বৃথা তর্ক জালে তাঁহারা জড়িত হন, শেষে হয় অবিশ্বাসী, না হয় মহা নারকী হইয়া, বিষম দুঃখে কষ্টে সংসার-লীলা শেষ করেন। সংসার-বাদী, অবিশ্বাস-বাদী মানুষকে হইতেই হইবে, প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের যদি এইরূপ মীমাংসা না করেন। মানব-ঘৃণা (misanthropy) এ হেন লোকের পরিণতি, মানব-বিদ্বেষ, এহেন লোকের অস্থিমাংস, মানব-নিন্দা পান আহার। মানুষ যতই কৃতঘ্ন হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মানুষের প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া, কেবল বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে হইবে, খাটিতে হইবে, নরসেবা করিতে হইবে। মানুষের অস্থির প্রকৃতির ভিতরে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতরে, নানা বিচিত্র ঘটনার ভিতরে এক অদ্বিতীয় চিন্ময় শক্তি হাসিতেছেন,এক অপরূপ জ্যোতি ফুটিতেছেন। যাহারা তাহা না দেখিল,সংশয়, অবিশ্বাস, অপ্রেম, কুজ্ঞান, পরনিন্দা গরলে তাঁহারা যে মজিবে, কিছুই বিচিত্র নয়। মানুষের দুর্দ্দিনে এক মাত্র বন্ধু তিনি,—চির অবিচলিত,চির-অপরিবর্ত্তিত তিনি। চিরদিন উপেক্ষিত হইয়াও তিনি মানুষের নিকটে প্রতিনিয়ত সত্যে, ন্যায়ে,জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে প্রতিভাত। তিনি, মানুষকে অসারের সার এবং প্রকৃত বন্ধুত্ব বুঝাইয়া, দুর্দ্দিনের মধ্যে সুদিনের অভ্যুদয়ের মর্ম্ম প্রতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জগৎকে ও তৎসহ আমাদিগকে মানব-[illegible] হইতে, অবিশ্বাস ও সন্দেহবাদ হইতে চিরকালের জন্য রক্ষা করুন। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সমাপ্ত।

SIDDHARTHA APPAREL

RAYMON

Code No. ______________________

Shade No. ______________________

D . E

TOTAL	Total Received To Date	Despatch Challan No.	Party To Whom Sent

35	36	37	38	39	40	41	42	TO

BALANCE

SIZES	TOTAL